মর্ত্যের অমরাবতী

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৯ সাল

প্রকাশ করেছেন : শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য
১৭০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি—১২

প্রচ্ছদপট : ছবি তুলেছেন লেখক
রূপদানে শ্রীভূদেব বিশ্বাস
ব্লক ও ছাপানয়
ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিও

ছাপিয়েছেন : শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ
অন্নপূর্ণা প্রেস
৩৩-এ, মদন মিত্র লেন, কলি—৬

বাঁধিয়েছেন : ন্যাশানাল বাইণ্ডারস

পরিবেশনার ভার নিয়েছেন :

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি—১২

সিগনেট প্রেস
১০।২, এলগিন রোড, কলি—২০

দাম ন সিকে

"কাশ্মীর যারা দেখেনি
তাদেরই হাতে তুলে দিলাম।"

দুটি কথা

'মর্ত্যের অমরাবতী' ভ্রমণ কাহিনী, সাহিত্য, বেলে লেটারস্ কি আলোচনা সে বিচারের ভার পাঠকের হাতে তুলে দিলাম। কারণ আমি কিছু বললে, তা প্রকৃত পরিচয় হবে না, হবে সাফাই গাওয়া । ভাষা ও বানানের দিক দিয়ে নতুন যুগের পথ ধরে চলবার চেষ্টা করেছি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম, আধুনিকতা ফুঁড়ে দু-চার জায়গায় প্রাচীন সংস্কার মাথা তুলেছে। ভাষায় গুরু হবার বাসনা নেই, তবে চণ্ডালীও সম্পূর্ণভাবে আপনার করে নেয়নি। ছাপা-কুহকিনী কাউকে ছেড়ে কথা বলে না, প্রুফ দেখার হাতে খড়ি হওয়ায় সে সামান্য বেশী আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বই ছাপার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছে বন্ধু শ্রীসুধাংশু ঘোষ ও শ্রীদুলাল চক্রবর্তী, তাদের কাছে আমি ঋণী। তাছাড়া নানা ভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদেরও আমার ধন্যবাদ। যাঁরা বইটা ছাপা হবার আগে ধৈর্য ধরে আমার দেবাক্ষর পাঠোদ্ধার করেছেন এবং যাঁরা পড়তে নিয়েও সম্পূর্ণ পড়বার অবসর পাননি তাঁদেরও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

কোলকাতা,
২৯শে মে, ১৯৫২ সাল।

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

স্বর্গ আর ভূস্বর্গ—'উপসর্গ' থাক আর নাই থাক, আমাদের কাছে প্যারা-বোলার দুই প্রান্ত—অর্থাৎ এ সম্পূর্ণ নাগালের বাইরে। আসলে স্বর্গে যাবার সাধটাই জীবনের উপসর্গ। কিন্তু ছাড়ালে না ছাড়ে কী করিব তারে? মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন—স্বর্গে যাবার বাসনা আধুনিকতার আবরণে সুপ্ত থাকলেও মনের অবচেতন কোনে তা যৌবনের আদিম মনোবৃত্তির মতই প্রবল। তাই বিরক্তের ভাব দেখিয়েও বারোয়ারী পূজোয় চাঁদা দেই, বাড়ীর মেয়েদের দোহাই দিয়ে কালীঘাটের মন্দির দর্শন করি, যোগ উপলক্ষে নিদেন পক্ষে সেবাদলের মাতব্বর সেজেও মাথায় গংগার জল ছিটিয়ে আসি।

মনের গোপন কোনে ভূস্বর্গ দেখার সাধ কার না হয়? কিন্তু সে যে রাজা রাজড়ার স্থান। আর আমরা হলাম যুদ্ধোত্তর যুগের পরম দারিদ্র্যপিষ্ট জীব—শ্রী কারণিককুলের সম্ভ্রান্ত সভ্য। দায়ভারে মাথা বেচা, দিনগত পাপক্ষয় গোছের অবস্থায় জীবন কাটাই—স্বর্গভোগ কল্পমাত্রসার।

যে সমাজের লোক ঠোঁটে পাইপ চেপে, কথার আগের দিকে অ্যাক্‌সেণ্ট দিয়ে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করছে এই অভিমানে, একটু বিকৃত করে বলে 'ক্যাশ্‌মিয়া'; কিম্বা সারিবন্দী গাড়ীর মাঝে গাড়ী ভিড়িয়ে ঢোকে টেনিস ক্লাবে; যারা ইভনিং ড্রেস পরে রাত কাটিয়ে আসে ডিনার ড্যান্স ও ক্যাবারে উপভোগ করে; যাদের পার্টি বলতে বোঝায় কক্‌টেল—ভূস্বর্গে তাদেরই একচ্ছত্র অধিকার।

ইন্‌টিগ্রাল বা ডিফারেন্‌শিয়াল যাকে আশ্রয় করে ক্যালকুলেশন করা যাক না কেন, সামেশন করলে দেখা যাবে আমাদের ভ্রমণের আপার লিমিট হল, দেওঘর বা পুরী—বেড়ান হবে, বায়ু পরিবর্তনও হবে। তার সংগে উপরি

পাওনা হচ্ছে দেবমাহাত্ম্য—মহাপ্রভুর আশীর্বাদ। আর দার্জিলিং গেলে বুঝতে হবে লিমিট ছাড়িয়ে ব্রেকিং পয়েণ্টে পৌঁছেচে। যাইহোক একদিকে আমরা পরম ভাগ্যবান বলতে হবে—আপ্তবাক্য আমাদের পরম সহায়। কী মিষ্টি কথাটা—পথি নারী বিবর্জিতা। রবীন্দ্রনাথ আরও পরিষ্কার করে দিলেন—পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য……অবশ্য তাঁর নিশ্চয় টাকার অভাব হয়নি। তবে বোধ হয়, স্ত্রীহারা হবার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল না, অন্য কেউ সস্ত্রীক গিয়ে বেশী আনন্দ উপভোগ করে। তাঁর মনোগত ভাব যাই থাকুক, এর জন্যে তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয়। অনন্ত বিশ্বের মাঝে আমি একা, এই আধ্যাত্মিকতাকে আঁকড়ে ধরলেও মনে হয়, খরচটা বড্ড বেশী।

তবুও দুজন বন্ধু, শেলী আর শিশির যখন জানাল, তারা কাশ্মীর যাবার প্ল্যান করছে ; আবার শুনলাম, একজনের কাকা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন এবং যুদ্ধের কাজে এখন কাশ্মীরেই আছেন, তখন দিগ্‌বিদিগ্‌ চিন্তা না করে বললাম—চালাও।

বোঁচকা বাঁধা বাঁধি সুরু হয়ে গেছে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটলাম বন্ধুর কাছে—হ্যাঁরে, কাশ্মীরে ঢুকতে নাকি পারমিট লাগে ?……লাগবে না ?…… ঠিক জানিস্‌ত ? দেখিস বাবা, জন্মের মধ্যে কম্ম, শেষে স্বর্গের দ্বারে পৌছে গলা ধাক্কা খেয়ে লোকলজ্জার ভয়ে গলায় দড়ি দেবার জোগাড় করতে না হয় ?

পৃথিবী যেন তার মুঠোর মধ্যে, এমন এক ঝিলিক হাসি ঠোঁটের আড়ালে বিকশিত করে বলে—লোকের কথায় ঘাবড়ে যাস কেন ? আমার ক্যাপ্টেন কাকা রয়েছেন সেখানে। চিঠিও লিখে দিয়েছি। হয়ত ষ্টেসন থেকেই একটা গ্র্যাণ্ড রিসেপ্‌শন দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। কী ওয়েলফার্ণিশড কোয়াটার। বয় রয়েছে, বাবুর্চি রয়েছে, তিনি আবার ভোজন বিলাসী—এত গেল আমাদের ন্যায্য দাবী। উপরি পাওনা হল একটা ছ-টনের ট্রাক, যা পড়ে আছে তাঁর পারসোনাল ইউসের জন্যে। মনের সাধে যত খুশী বেড়াও।

তখনই চোখ বুঁজে স্বর্গসুখটা কল্পনা করে নিলাম।

স্বর্গ হল ইন্দ্রের অমরাবতী আর মর্ত্যের অমরাবতী হল কাশ্মীর। স্বর্গে দেবলোক আছে, অনন্ত-যৌবনা উর্বশী আছে, পারিজাত আছে। ভূস্বর্গে আছে রাজা মহারাজা, আছে মনোলোভা প্রকৃতি, আছে ভোগের বিলাস অনিন্দ্য-সুন্দরী। একটি গড়েছেন শ্রীভগবান অপরটী কাশ্যপ মুনি। জানিনা শ্রীভগবানকে দেবলোকে আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে যুদ্ধযাত্রা করতে হয়েছিল কিনা, তবে কাশ্যপ মুনিকে কেষ্ট লাভের জন্যে কষ্ট করতে হয়েছিল।

আগে এখানে পাহাড় ছিল না, এ ছিল এক বিরাট জলাভূমি। কালক্রমে জলের গভীরতা কমে এল। তখন দৈত্যরা বেছে নিল বসবাস করার জন্যে। তারপর নজর পড়ল কাশ্যপ মুনির। তিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, বুঝলেন ইনভেষ্ট করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। জামার আস্তিন গুটিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, যুদ্ধে দৈত্যরা পরাজিত হল। এবার কনষ্ট্রাক্টিভ প্রগ্রাম সুরু করে দিলেন। জল স্থানান্তরিত করে তৈরী হল স্থল; আর সৃষ্টি করলেন সুন্দর ঝর্ণা, হ্রদ, নদী—তৈরী হল স্যাটেলাইট স্বর্গ। তাঁর নাম অনুসারে এই স্বর্গের নাম হল কাশ্মীর।

যাক ভারতবাসীর পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। কালোবাজার সংক্রামিত যুদ্ধোত্তর জনসমাজের কেউ, বোধ হয় স্বর্গে যাবার ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দিতে পারবে না। জাহান্নামে যাক জন্মান্তরের ইন্দ্রপুরী। তাই বলে ভূস্বর্গের পথ রোধ করে এমন ক্ষমতাত কারও হবে না। সত্যমেব জয়তে! কাশ্যপ মুনির জয় হোক।

সেদিন ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ সাল। ত্র্যহস্পর্শ মিলে জয় মা বলে যাত্রা করলাম, অবশ্য তরী ভাসিয়ে নয় ট্যাক্সি সহযোগে। গাড়ী এসে দাঁড়াল হাওড়া ষ্টেসন। বললাম—পান্‌জাব মেল। কুলি বলে—বাবু, ফার্ষ্ট ক্লাস?

বেশী মর্যাদা দিলে দোষের নয়, বিপরীত হলে অসহনীয়। সগর্বে জানাই, চলো গান্ধীক্লাস।

তার অর্থোদ্ধার করতে না পারলেও দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করার সাহস হয়নি, বোধহয় বকশিশ মারা যাবার মিথ্যা আশংকায়।

গাড়ীতে উঠতে বেগ পেতে হল না। মারামারি কাড়াকাড়ির ভয় নেই—দরজায় দাড়িয়ে প্যাসেঞ্জার গাইড, রিসার্ভেশন নম্বর মিলিয়ে কামরায় উঠতে দিচ্ছে। কিন্তু ভেতর ঢুকে দেখি এক সর্দারগোষ্ঠী প্রায় ঘর সংসার বিছিয়ে ফেলেছে, সেখানে আর তিল ধারণের স্থান নেই। গলাবাজি থেকে মৃদু হাতাহাতি পর্যন্ত গড়িয়ে গেল। অবশ্য তার নিস্পত্তি হল পিস্‌ফুল নেগোসিয়েশনে ও গায়েপড়া মিডিয়েটারের সহায়তায়।

গাড়ী ছেড়ে দিল। সর্দারজী পাগড়ী খুলে মাথায় হাওয়া লাগিয়ে নিল। আমরাও পুরু বিছানা পেতে পা ছড়িয়ে বসলাম। ক্রমে ভাব জমে উঠল সর্দার-গোষ্ঠীর সংগে। একটু আগে যে তাদের সংগে লংকাকাণ্ড ঘটে গেছে তা ঘুণাক্ষরে মনে হয় না।

তৃতীয় শ্রেণীর রিসার্ভেশন ব্যাপারটা বড় চমৎকার। হাওড়া ছাড়ালেই রিসার্ভেশন রূপী স্বাচ্ছন্দ্য ডিভোর্স করে দিল। এর বিরুদ্ধে আইনজ্ঞ মারফৎ আবেদন করা চলে না, চলে ফিসিকাল কালচারের অবদান। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এত কোন ছার তৃতীয় শ্রেণীর তক্তা। কর্তৃপক্ষকে জানালে আমাদের দাবী যেন অন্যায় আবদার বলে গণ্য করেন এবং অবজ্ঞার হাসি হেসে উত্তর দেন—এইত নিয়ম? মনোগত ভাবটী যেন, থাড্‌ড ক্লাসের ত খদ্দের, অতো হাক ডাক কিসের? অবশ্য কর্তৃপক্ষ বলতে যাদের সংস্পর্শে আমরা আসি, অর্থনৈতিক মানে তারা আমাদেরই সমগোষ্ঠী। হয়ত স্ত্রীর কাপড় জোগাড় করতে গিয়ে আগের দিন তিন ঘণ্টা লাইনে দাড়াতে হয়েছে। কিন্তু আপাত ক্ষমতার মোহে ক্ষণতরে ভুলে যাই যেসব কথা, মনেহয় আমি একজন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা গোছের লোক।

এই রিসার্ভেশন নিয়ে একজন অত্যন্ত সিরিয়াস হয়ে মন্তব্য করেন—কাগজে কলমে সমাজতান্ত্রিকতা দেখাতে গেলে নাকি এ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে। পণ্ডিতজীও রেশনের লাইনে দাড়ান, মুন্সীজী মিস-এ-মিল সপ্তাহ পালন করেন, গান্ধীজী······

বাধা দিয়ে বলি—থাক গান্ধীজীকে নিয়ে আবার টানা পড়েন কেন? আজকের প্রগতিশীল সভ্যযুগের কথা ত কোন ছার, প্রাচীন রোমান আইনেও মৃত ব্যক্তিকে অব্যাহতি দিত: Actio personalis moritur cum persona। বরং আমি একটা মুখরোচক ঘটনা বলি শুনুন:

১৯৪৮ সাল। বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী, শ্রী বি. জি. খের দিল্লীতে এসেছেন কোন কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে। ফিরে যাবার দিন হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, এইরে! ট্রেণে সিট 'রিসার্ভ' করতে ভুল হয়ে গেছে! তখনি স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক বার্তাবাহক বেজে উঠল। কিন্তু তাঁরা জানালেন...স্যার...সরি স্যার...এমন অসময় বার্থ কোত্থেকে পাব স্যার। আর...স্যার...আপনি যখন যাবেন স্যার, ফার্ষ্ট ক্লাস ত পড়ে রয়েছে?

উ-হুঁ! মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলে তাঁর নীতিকে ত ক্ষুন্ন করতে পারেন না, কিন্তু তাঁর যাওয়ারও বিশেষ প্রয়োজন। যাক মেড-ইসি সেকেণ্ড ক্লাসের উদ্ভব হয়ে গেল—প্রথম শ্রেণীর পাশে একটা দাগ বসাতে ত বেশী কষ্ট হয় না।

যাইহোক ষ্টেসন এলেই সর্দারজীকে সামনে ঠেলে দিয়েছি। সে তার বিরাট বপু নিয়ে পথ আগলে দাড়িয়েছে, আর আমরা প্রয়োজন বোধে পেছন থেকে গলাবাজি করেছি। আভিজাত্যের আড়ম্বর দেখানর জন্যে কখনো ইংরাজীতে বলেছি, আবার কখন বা সামলে উঠতে না পেরে ভাবীকালের রাষ্ট্র ভাষা অর্থাৎ খিচুড়ী হিন্দির তুবড়ী ছুটিয়েছি। অবশ্য সে ভাষা নিজেদের কানেও মাঝে মাঝে আঘাত দিয়েছে, তখন যুক্তি খাড়া করেছি আমরা যে প্রগতিশীল।

বলতে কি এমন উৎসাহ বেশীক্ষণ টেঁকে না। তারপর খানা খেয়ে, সর্দারজী যখন তরল গরল পিয়ে চেপে বসল, আর ঠেলে তোলা গেলনা। বরং সহানুভূতি জানিয়ে বলেছে—গরীব ব্যাচারী আনে দিজিয়ে। আর বেশী বলতে সাহস হল না, কারণ সোমরস সিঞ্চিত লাল চোখ রক্তচক্ষুতে পরিণত হতে কতক্ষণ?

রাত হয়ে আসছিল, অনেকেই ইতি মধ্যে একপ্রস্থ নিদ্রা সেরে নিয়েছে। কোন ভদ্রতার বালাই নেই, কারো কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ নেই—একজন আর একজনের ওপর তার নিদ্রিত দেহভার নির্বিবাদে চাপিয়ে দিয়েছে। পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিয়ে বাইরে চেয়েছিলাম—উদ্দেশ্যহীন চাহনী। বেশ লাগছিল ঠাণ্ডা হাওয়াটা।

জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ট্রেনের এক হ্যাঁচকায় জেগে উঠলাম।··· একি! আমার গায়ের উপর কোন ক্ষীনাংগীর তনুলতা শোভা পাচ্ছে! নিদ্রার ঘোরে সামনের সর্দারগৃহিনী কখন তার অমল-ধবল-কোমল-চরণযুগল তুলে দিয়েছে। নাঃ! এ এক বিপদ—কেমন যেন মোহময় অথচ অস্বস্তিকর। ভাবলাম—'পাইনজী' বলে ডেকে তুলি, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা হল। সর্দারজীর রক্তচক্ষুর কথা মনে পড়ে গেল······যেন ঘুমিয়ে আছি, এইভাবে মিট্ মিট্ করে আতংক ভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখে নিলাম আর কেউ দেখছে কিনা। শেষে সেই অবস্থায় ঘুমের ভান করে চোখটা বুঁজিয়ে দিলাম।

শিশির ডেকে তোলে—নে চা জুড়িয়ে গেল? ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। দেখি সবাই উঠে পড়েছে। সর্দারজী সৎ-শ্রী-আকাল বলে শুভপ্রভাতের ইংগিত জানাল। আশ্বস্ত হলাম। তার তরুণী ভার্যার রাত্রের সে অবস্থাটা নিশ্চয় তার দৃষ্টিগোচর হয়নি। অনেক সাহস সঞ্চয় করে ধীরে ধীরে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম, দেখি তিনি ওড়না জড়িয়ে উঠে বসেছেন, যেন একটু জড় সড় ভাব। ভাবলাম, লজ্জা হল নাকি? কিন্তু তাত পান্জাব রমণীর স্বভাব বিরুদ্ধ।

কিন্তু একি! যা লোক দেখেছিলাম রাত্রে শোবার সময়, এযে প্রায় তার দ্বিগুণ। ঘুমের মাঝে আমাদেরও যে ঠেলে দিয়েছে আদ্দেক।·······ওদিকে শেলী তখনও খুৎ খুৎ করছে—ওর বিছানার চাদরটার ওপর শুধু কে রেখে গেছে চরণ রেখা গো। বলাবাহুল্য তা সকর্দম।

বেনারসে মধ্যাহ্ন ভোজন সারতে গিয়ে এক বিপদ। একজনকে তিনটে

খানা আনবার অর্ডার দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে একজন বলে—বাবু খানা লিজিয়ে! দেখি তিনটী খানা সাজান। টেনে নিলাম। আদ্দেক খাওয়া হয়েছে এমন সময় আর একজন বলে—বাবু খানা ?······খানাত আমার কী ? খানার দাওগে যাও।

বলে—অর্ডার দেকে খানা নাহি লেগা ?

—সেকি ? খানাত পেয়ে গেছি।

—আপতো হামকো বানানে বোলা, আউর দুসরা আদমিসে লে লিয়া······ নাহি লেগা কুছ্ হরজা নাহি হ্যায়, লেকিন বিল কিলিয়ার কর দিজিয়ে।

বুঝলাম অর্ডার দিয়েছি একজনকে, আর খানা টেনে নিয়েছি আর এক জনের কাঁধ থেকে। পাঁচ স্কোয়ার ইঞ্চি মুখ ছাড়া তাদের দেহের অবশিষ্টাংশ একই পোষাকে মোড়া, এরকম ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যার খানা খেতে সুরু করেছি তাকে ত পয়সা না দিয়ে পারা যায় না। তাই বোকা সেজে খেয়েই চললাম। কিন্তু তারাও নাছোড়বান্দা—অবস্থা জটিল করে তুলল। হৈ চৈ হতেই ওদের দলের আরও কয়েকজন ছুটে এল।

তাদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে—আপ হিন্দু হোকে মুসলমানকো খানা খাতা ?

দেখলাম দ্বিগুণ খরচ থেকে অব্যাহতি পাবার এই ব্রহ্মাস্ত্র। ধর্মধ্বজার স্মরণাপন্ন হতে হল। তাকে যেন আসামীর কাঠগড়ায় দাড় করিয়ে চার্জ করলাম —তুম্ মুসলমান হ্যায় ? পহলে কাহে নাহি বোলা ? তুম মেরা জাত মার লিয়া ?

গাড়ী শুদ্ধ লোক অমনি হাঁ হাঁ করে উঠল—এত বড় অনাচার—হিন্দুস্থানে বসে হিন্দুর জাত মারা! তার অবস্থা তখন সংগীন। ব্যাচারা তখন দেখে দক্ষিণাত দূরের কথা, ভালোয় ভালোয় জানমাল কবুল করতে পারলে হয়।

সর্দারজী আর তার আত্মীয় গোষ্ঠীর এ যাত্রার সীমানা হল লক্ষ্ণৌ। বিকেল বেলা বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে সর্দার দম্পতীরা যখন চলে গেলেন মনে হল যেন

কত দিনের পরিচিত বন্ধুকে বিদায় দিলাম। ক্ষণিকের জন্যে হলেও একটা বিষাদের ছায়া মনের ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

পরের দিন ভোরে আবার শিশির ডাকতে আরম্ভ করেছে।

বলি—কিরে? চাগ্রাম নাকি?

বলে—আমার জুত?

—জুতর কি হল?

—নিশ্চয় চুরি।

—দূর! জুত যাবে কোথায়? ভাল করে খুঁজে দেখ্।

ট্রেন তোলপাড় করেও জুতর সন্ধান পাওয়া গেল না। হায় ব্যাচারার কী অবস্থা! বলে—জুত যায় যাক, সে ক্ষতির জন্যে ভাবি না, কিন্তু কোট প্যাণ্ট পরে খালি পায়ে যখন রাস্তায় নামব—ওঃ! মনে হবে সবাই আমার দিকে ক্যাট্ ক্যাট্ করে চেয়ে রয়েছে। কি ন্যাষ্টি অ্যাণ্ড শেমফুল।

—খালিগায়ে জাতির জনক গান্ধীজী পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেন, আর খালি পায়ে তুই পাঠানকোটে নামতে পারবি না?

কাটাঘায়ে নুনের ছিটে। বয়েস কম থাকলে হয়ত ঘুসি মেরে বসত··· যাইহোক আমার বাড়তি জুতোজোড়াটা দিয়ে তাকে আসন্ন মানহানির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলাম।

* * * * *

দীর্ঘ নীরস যাত্রার মধ্যে দিয়ে পর দিন দুপুরে অমৃতসরে পৌছলাম। দেখি সব তেতে পুড়ে রয়েছে—শরীর, মন এবং আবহাওয়া। মেন লাইনের সামনেই দাড়িয়ে রয়েছে পাঠানকোট যাবার ট্রেন। ষ্টেসনের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল হলদিঘাট, কুরুক্ষেত্র বা ট্রয়ের কোন অংশে এসে পড়লাম নাকি? প্রায় সবাই খাকি বস্ত্রেণ মণ্ডিত—একদল চলেছে কাশ্মীর মুখো আর একদল ফিরছে সেখান থেকে। বসে আছি ট্রেনের কামরায় হঠাৎ বাইরে খড়ি দিয়ে আঁচড় কেটে দিল। তারপর জানাল, এ মিলিটারীর জন্যে রিসার্ভ করা। শক্তের

পূজারী সবাই, তাই নমস্তস্মৈ জানিয়ে অসামরিক সবাই সুড়্ সুড়্ করে অন্যত্র জায়গা খুঁজতে গেল। হে খাকি, তুমি মোরে করেছ সম্রাট, পরায়েছ গৌরব মুকুট। গাড়ীতে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলাম। যেন মনোগত ভাবটি—তুম্‌ভি মিলিটারী, হাম্‌ভি মিলিটারী।

পাঠান কোট পৌছলাম বেলা তখন চারটে। তৃষিত নয়নে চেয়ে আছি ক্যাপ্টেন কাকার পথ চেয়ে। হয়ত খাকি পোষাকের মধ্যে ডুবে গেছি, ছেঁকে তুলতে পারছেন না···ষ্টেশন একে একে ফাঁকা হয়ে আসতে লাগল। এখনও এলেন না ? নাঃ ! তাঁর বড় দেরী হচ্ছে···তবেকি তিনি আসবেন না ? একথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না। মনকে প্রবোধ দেই, ক্ষেত্র বিশেষে এমন দেরীত সবারই হতে পারে। মিলিটারী হলেও বাঙালী ত তিনি।···কাজের লোক, হয়ত একটা জরুরী কাজ হাতে পড়েছে, সেটা না সেরে ত আসতে পারেন না··· এও হতে পারে, আসতে আসতে পথে গাড়ীর ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে, এমনত আখছার হয়।

ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা। অত্যন্ত অনিচ্ছায় আশা ছেড়ে দিতে হল। অগত্যা মধুসূদন, বেরোলাম কাশ্মীর যাবার বাসের সন্ধানে। "নিউ সুরজ বাস কম্পানী" জম্মু পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে যায়, সেখান থেকে আবার ভিন্ন বাস। টাকা বাড়িয়ে দিলাম—তিনখানা সেকেণ্ড ক্লাস। —টিকিট ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, পারমিট আছেত ?

—পারমিট ? এখানে আমাদেরও কি পণ্যের সগোত্র হয়ে চালান যেতে হবে ?

যুদ্ধের দৌলতে নাকি পণ্য ও মহামান্য একস্তরে এসে গেছে, একেবারে আলট্রা কমিউনিস্‌ম।

শুনলাম, সামরিক কর্মচারীদের পারমিট দেবার জন্যে বেস হেড কোয়াটার আছে, আর বেসামরিক হলে কলকাতা, দিল্লী আর অমৃতসর ছাড়া গতি নেই।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হায়রে! শেষ পর্যন্ত আবার অমৃতসরে পিছু হটে যেতে হবে। সেখানেও ত রেকমেণ্ডেশনরূপী প্রতিবন্ধক। লটারীর টিকিটেও লোকে বড়লোক হয়, তাই বরাত ঠুকে চললাম বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। সেখানকার No Admission প্রাচীরপত্র পেরিয়ে গেলাম কিন্তু পারমিট কোথায়? পরিষ্কার জবাব—মিলিটারী নও, কেন মিছে বিরক্ত করতে এসেছ।

ত্র্যহস্পর্শের দৃষ্টি বোধহয় ততক্ষণে ম্লান হয়ে গেছে। সেই অফিসারের সার্জেণ্ট সিভিলিয়ান ডিক্সানারীতে যাকে বলে পি. এ. তিনি একজন বাঙালী। ঘাক ধড়ে প্রাণ এল। পায়ে পড়ি আর কি—দাদা এ যাত্রা উদ্ধার করুন, না হলে দেশে মুখ দেখাতে পারব না।

তিনি বলেন—আচ্ছা কাল আসবেন, দেখি কী করতে পারি?

শয়নং যত্র তত্র, ভোজনং হট্টমন্দিরে। হট্টমন্দির অবশ্য আমাদের আপ্যায়ন করার জন্যে সদাই প্রস্তুত। তবে দুঃখ এই, প্রণামীটা একটু বেশী নিল। শুভ সংবাদ, পরদিন সকালেই ভাদুড়ীদাদার সৌজন্যে পারমিট পেয়ে গেলাম।

* * * *

সাতটা নাগাৎ বাস ছাড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে এল মাধুপুর। সামনেই বিরাট রাভি নদী। একে একে সবাই বাস থেকে নামল, পারমিট চেক হবে। রাস্তার ধারেই একখানা চালা। তার সামনের গাছতলায় চেয়ার টেবিল পাতা। টেবিলে একখানা জাবদা খাতা আর আদভাঙা দোয়াত ও কলম। যাত্রীদের বসবার জন্যে দুখানা বেঞ্চপাতা, মনে হয় যেন সদ্য গাছ থেকে ভেঙে আনা হয়েছে; ভেতরে এখনও হয়ত অস্‌মোসিস্ ক্রিয়া চলেছে। একে একে সবার পারমিট দেখে নাম, ধাম, কুষ্ঠী, ঠিকুজী লিখে তার ছাড়পত্রের যোগ্যতা স্বীকার করছেন। সবার শেষে হল আমাদের পালা। ঊর্ধতন কয়েক পুরুষকে স্মরণ করার পর আজ্ঞা হল—কোথা হতে আগমন? কোত্থেকে পেলেন এই ছাড়পত্র? কে আছেন সেখানে? যাবার কী উদ্দেশ্য?

কোন রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে কিনা? কলকাতায় কার কোথায় বাড়া? ...ভাবছিলাম রগচটা লোক হলে এখানেই হয়ত কাশ্মীর যুদ্ধের এক অধ্যায় সুরু হয়ে যেত। যাক শেলীর উপস্থিত বুদ্ধি আছে। বলে—আমাদের সবার বাড়ীই কালীঘাটে। গুরদ্বোয়ারার কাছেই। কথাটা সর্দারজীর মনঃপূত হল।

—হ্যাঁ ওখানে আমি গিয়েছি।

শেলী আবার যোগ করে দেয়—কাছেইত তোমাদের দেশের লীলা দেশাই থাকেন।

—ঠিক বলেছ।

যাক আমাদের অগ্নিপরীক্ষার প্রথমপর্ব লীলা দেশাই-এর মাধ্যমে শেষ হল। চিত্রতারকার জয় হোক। উঠলাম গাড়ীতে গিয়ে। ব্রিজের ওপর কড়া পাহারা। আস্তে আস্তে অপর পারে গিয়ে পৌছলাম। আবার গাড়ী থামল। এবার মহাপ্রভু ভক্তদের জন্যে নিজেই ছুটে এলেন। আমাদের কাছে এলে আবার প্রশ্নবান—যেন খুনী আসামীদের প্রতি জেরা।

মাইল খানেক যেতে না যেতেই আবার গাড়ী ব্রেক কসে দাড়াল। দেখি সমস্ত মাল বাসের মাথা থেকে নামিয়ে ফেলছে। কি ব্যাপার? এটা Land Customs Office, দেখছে কেউ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে কিনা।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। আমি বলি—শুনেছিলাম পাঠান কোট থেকে জম্মু পর্যন্ত রাস্তা একটা আছে, তবে জাতিতত্বে সে সিডিউল কাষ্ট, শুধু প্রটেকশনে শানাবে না, কন্‌সট্রাকশন করতে হবে। কিন্তু এযে দেখি মহত্তের লীলা! বিরাট পাকা রাস্তা, বড় বড় সুন্দর ব্রিজ, যেন মনে হয় সতী সীমন্তিনী। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর চতুর্থ ভদ্রলোক, যার সংগে আলাপ জমাতে চেষ্টা করেও সফল হয়নি, তিনি হঠাৎ কথার বাণ্ডিল খুলে দিলেন—শুনেছিলেন সত্যি কথা, আবার যা দেখছেন তারত সত্যি অসত্যির কথাই ওঠে না।

—তাহলে দুই সত্যির মধ্যে পড়ে চিড়ে চ্যাপ্টা মনকে গোলক-ধাঁধায় পাঠাতে হয়।

—না, তার প্রয়োজন হবে না। প্রথমটি অতীতে সত্যি ছিল, যা দেখছেন, বর্তমানে তা সত্যি।

—তাই বলুন, নতুন তৈরী হয়েছে রাস্তাটা।

তাঁর কথায় বুঝলাম, সে নাকি এক মস্ত মহাভারত। আর অর্থব্যয়কে অনেকখানি ডবলমার্চ করতে হয়েছে উপযোগিতার সংগে পা মেলাতে গিয়ে।

তিনি বলেন—কাশ্মীর যাবার দুটী পথ ছিল। একটা রাওয়ালপিণ্ডি দিয়ে, অপরটী রেলপথ, শিয়ালকোট হয়ে। দুটই পাকিস্থান এলাকায়। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে দুর্বিপাক দ্বারে হানা দিল। দেখা গেল, একদল স্বার্থান্বেষী লুটতরাজ, নারীহরণ, নরমেধ যজ্ঞ করে কাশ্মীরকে আজাদ করতে এসেছে।

বলি—বিষে বিষ ক্ষয়, হত্যা করে দারিদ্র্য দূর করবে।

তিনি বলেন—শ্রীনগর-রাওয়ালপিণ্ডির পথ বন্ধ করে দিল। জম্মু-শিয়ালকোটের রেলপথ ও রাস্তা দিল আটকে। ভেবেছিল, শ্রীনগরকে চারিদিক থেকে আটকে পাকিস্থানের সংগে যোগ দিতে বাধ্য করাবে। কিন্তু শেখ আবদুল্লার দেশাত্মবোধ, সুদূর প্রসারী দৃষ্টিশক্তি এবং জাতীয়বাদিতা যোগাযোগ স্থাপন করাল দিল্লীর সাথে। ২৭শে অক্টোবর ভারতীয় সৈন্য প্লেনে করে পৌছল শ্রীনগর। কিন্তু প্লেনের পক্ষে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা অসম্ভব। নেতারা কি কোনদিন কর্মীর অভাব পূরণ করতে পারে? বেনারসী দিয়ে আটপৌরে কাপড়ের কাজ? রাস্তা চাই, যার ওপর দিয়ে গাড়ী চলতে পারবে, রসদ যেতে পারবে। জম্মু শ্রীনগরের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট রাস্তা ছিল না। ছাড়া ছাড়া, কান বেড় দিয়ে নাক দেখান গোছের একটা ছিল। কিন্তু সে কাঁচা রাস্তা দিয়ে একটা রাজ্যের সকল কাজ মেটান যেতে পারেনা, যুদ্ধের সময়ত নয়ই। গাড়ীর চাকাই হয়ত বসে যাবে।

তার ভেতর দিয়েই যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতীয় সৈন্যরা এগিয়ে গেছে, যখন তাদের রসদ আদৌ পৌছতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট

অবকাশ ছিল। বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে সৈন্যরা না হয় গেল। কিন্তু রাস্তাত একটা চাই। ভারত সরকার সুরু করে দিল পথ তৈরী করতে এবং তিনমাসের মধ্যে তিনকোটী টাকা খরচ করে গড়া হল পাঠান কোট থেকে জম্মু এই ৭০ মাইল পথ। এর জন্যে গড়তে হয়েছে বড় বড় ব্রিজ, যা লম্বায় যথাক্রমে ২,৮০০ ফিট, ২,০০০ ফিট এবং ১,০০০ ফিট। রাভি আর উঝ নদীর ব্রিজ তুটো ত পেরিয়ে এসেছেন আর একটী পাবেন ঠিক জম্মু সহরের আগে।

আবার তিনি বলে চলেন—আজ কত সহজে এবং স্বল্প ব্যয়ে গাড়ী চড়ে চলেছেন। কিছুদিন আগের অবস্থা আপনারা আজ কল্পনা করতে পারবেন না। পাঠানকোট থেকে জম্মু এক মন মাল আনতে মাশুল আদায় করেছে দশটাকা, বর্তমানে যার প্রাপ্য হল পাঁচসিকা।

সে সময় ট্রেন, বাস, লরী সব পাকিস্থান আটকে দিয়েছিল। অবশ্য পরে তারা লরী আর বাসের সদব্যবহার করেছে সৈন্য আর অস্ত্র শস্ত্র পাঠিয়ে, হত্যা আর লুঠতরাজ চালাবার জন্যে। এ দিকে যা তুএকখানা গাড়ী অবশিষ্ট ছিল, তারা দেখল এই স্বুবর্ণ স্বুযোগ। কারও সর্বনাশ কারও পোষমাস। অমানুষিক দর হেঁকে বসে থাকল। যেখানে জীবন-মরণের সমস্যা, পয়সার হিসেব থাকে না মানুষের।

সমাধানের জন্যে সরকার পক্ষ এগিয়ে এলেন—নিজস্ব বাস চালানোর পরিকল্পনা নিয়ে। পাঠান কোট থেকে জম্মু এবং জম্মু থেকে শ্রীনগর সরকারী বাস চলাচল স্বুরু হল। ষ্টেট বাস পরিকল্পনার উৎপত্তি বোধহয় এখান থেকে এবং এখানেই প্রথম ষ্টেটবাস চলাচল স্বুরু হয়। সরকার পক্ষ থেকে শুধু কয়েকটা বাস কিনে এর সমাধান সম্ভব ছিল না, তাই এর জন্যে নতুন বিভাগ খোলা হল এবং তার ভার নেন স্বুযোগ্য মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ।

নিউসের উত্তরপর্ব হল ভিউস। তথ্য শেষ করে এবার পাণ্ডিত্য স্বুরু করেন। বলেন—এতটাকা খরচ করে ভারত সরকার রাস্তা তৈরী করলেও তা সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। পাঠান কোট থেকে জম্মু আজ লোক বেশ নিরাপদেই

যাতায়াত করছে। যদি যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকে, তা হলে এ রাস্তা ভারত ও জম্মুর যোগাযোগের পক্ষে কোন অসুবিধা সৃষ্টি করবে না। তবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখলে, তেমন আশাপ্রদ হবার যথেষ্ট অন্তরায় আছে। এই রাস্তার অনেক অংশ পাকিস্থানের গা ঘেঁসে এগিয়ে গেছে। যে রাস্তার সংগে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাণবায়ু বিজড়িত, যার ওপর তাদের ভবিষ্যৎ, তাদের উন্নতি নির্ভর করছে, তা আরও নিরাপদ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আশা করা যায়, ভবিষ্যতে নিরাপদ এলাকার ভেতর দিয়ে ভারত ও জম্মুর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হবে। তাও সকল অসুবিধা দূর হবে না। কারণ ভারত বিভাগ হবার আগে জম্মুতে বহু কলকারখানা তৈরী হয়েছে, তারা প্রধানতঃ নির্ভর করত শিয়ালকোট জম্মু রেলপথের ওপর, কিন্তু আজ তা পাকিস্থানের কবলে। সুতরাং এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন রেলপথের। পাঠান কোট থেকে জম্মু পর্যন্ত রেলপথ করা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। তাকে শ্রীনগর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে হলে ব্যয়ের অংক হয়ত নিষিদ্ধ সীমানায় চলে যেতে পারে, তবে উধমপুর পর্যন্ত তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারা যায়। দেশ তাতে অনেক সমৃদ্ধশালী হবে।

উধমপুরকে অধমপুরে পাঠিয়ে একটু হাঁপ ছেড়ে নেব ভাবলাম। গভীর তত্ত্ব শুনে মাথাভারী হয়ে যাচ্ছে—'টপহেভী'কে কে না বিরস ভাষায় আপ্যায়ন করে। তবুও ভদ্রতার খাতিরে বলি—আপনি দেখছি একজন বিরাট জ্ঞানী, আপনার সাহচর্য পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

হা হতোস্মি! অমনি নতুন উদ্যমে তিনি বলতে সুরু করেন—জম্মু নামের উৎপত্তি জানেন? জময়ন্ত নামে নাকি শ্রীরামচন্দ্রের এক সেনাপতি ছিলেন। সৈন্য-বৃত্তিতে বিতৃষ্ণা হওয়ায় তা ছেড়ে সাধক হন।

—দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হয়েছিলেন রাম নামের মাহাত্ম্যে, রাম সাহচর্যে সৈন্য সাধক হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?

—সেটা আমার বক্তব্য নয়, তাঁরই নাম অনুসারে এই জম্মু নাম। জম্মুর

আয়তন ১২৩৮ বর্গ মাইল এবং এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ২১ লক্ষ। জম্মুর পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বৃহত্তর অংশকে বলা যেতে পারে ডোগরাদের দেশ। উধমপুর, রাইসি, জম্মু, কাথুয়া, ভীমবর ও মীরপুর এর অন্তর্গত। মীরপুর জেলা এবং ভীমবরের প্রায় অর্ধেকটা এখনও পাকিস্থানের অধিকারে। এখানকার প্রায় সকল অধিবাসী হিন্দু। ছিপছিপে গড়ন এবং কর্মঠ। এই অংশ ভারতীয় পান্‌জাবের সংলগ্ন। আচার, ব্যবহার, সংস্কৃতিতে ভারতের সংগে এঁদের পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। কাংড়া উপত্যকা, গুরুদাসপুর এবং হোসিয়ারপুর হিমাচল প্রদেশের অংশ বিশেষ বলা যায়। জম্মুর পশ্চিম অংশ হল, মীরপুরের কিছু অংশ এবং পুঞ্চ জেলা। এই ক্ষুদ্র অংশের বেশীরভাগ মুসলমান এবং এই অংশ পাকিস্থানী পান্‌জাব সংলগ্ন।

জম্মুকে বলা যেতে পারে সোনায় ভরা দেশ। বনসম্পদত আছেই, তা ছাড়া রাইসি জেলায় ৩৬ মাইল ব্যাপী ক্ষেত্রে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌দের ধারণা ১০০, ০০০, ০০০ টন সহজলভ্য কয়লা সেখান থেকে পাওয়া যাবে। আরও দেখা গেছে. ওখানে আবিষ্কৃত কয়লার শতকরা ৬০ থেকে ৮২ ভাগ কার্বন। এখানে পেট্রোল পাওয়া যাবে বলেও আশ্বাস পাওয়া গেছে। ভাল জাতের সিমেণ্ট, তামা, সীসা, রূপা, নিকেল, জিন্‌ক, ম্যাংগানীজ এবং লৌহ লুকানো আছে এর ভূগর্ভে।

আমি বলি—তার থেকে কি পাওয়া যায় না, বলতে পারেন কী? অবশ্য কথাটার পর ব্র্যাকেটে ছিল উইথ অ্যাপলজি।

তিনি বলেন—অতিরঞ্জন কিছুই নয়, সব সত্য তথ্য। ভালো লোহা যে রাইসি জেলায় পাওয়া যায় তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ রয়েছে রামবানের ঝুলান ব্রিজ, যা জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে চেনাব নদীর ব্যবধানকে বিদূরিত করেছে। তা স্থানীয় লোহা ও স্থানীয় কারিগর দিয়ে তৈরী হয়েছে, মহারাজ রণবীর সিংহের সময় (১৮৫৭—১৮৮৫ খৃঃ)।

তিনি আবার বলেন—কাশ্মীর তার সৌন্দর্য দিয়ে পৃথিবীর সকল দেশের

লোককে আকর্ষণ করেছে। আজ সেই কাশ্মীর নিয়ে উনোর কষ্টকল্পিত মাথাব্যথা। তাঁরা রাজনৈতিক আকাশকে যেন আরও ধূমায়িত করে তুলেছেন—যা আমার মনে হয় নিরর্থক। জম্মু কাশ্মীরের অংশবিশেষ, অন্য সকল কারণ ছাড়াও কেবল জম্মুই, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের সংগে সংযুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট কারণ। তাঁকে বুঝিয়ে দেই, বাংলা ভাষায়ও এমন একটা প্রবাদ আছে—কান টানলে মাথা আসে।

এবার একেবারে ক্লাইম্যাক্সে উঠল। তিনি বলেন—জহরলালজী একজন পণ্ডিত হতে পারেন, আদর্শবাদী কংগ্রেসসেবী হতে পারেন কিন্তু তিনি ডিপ্লোম্যাট নন।

—কী বলছেন ? পৃথিবীর সেরা লোকেরা যাঁকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ্ বলে মনে করেন, তাঁর বিরুদ্ধে এই মন্তব্য। এ পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই আখ্যা পাবে না।

—উত্তেজিত হবেন না। বলি শুনুন—কাশ্মীর সরকার যখন ভারতের সংগে নিজের সম্পর্ককে এক করে দিল, তখন কাশ্মীর ভারতেরই অংশ। সেখানে যুদ্ধ করা আর ভারতের বুকে যুদ্ধ করা, একই কথা। তার ওপর ভারত সরকার যখন বাহুবলে ২/৩ অংশ পুনরাধিকার করে নিয়েছেন এবং এও সুস্পষ্ট, যে আর কয়েকদিনের মধ্যে তাঁদের সমগ্র রাজ্য তাঁরা ফিরে পাবেন ; সেই সময় ছুটলেন লেক্সাক্সেসে দরবার করতে—তার সাক্সেস্ত দেখতেই পাচ্ছেন। আবেদন নিবেদন, নাকে কান্না চিরদিন দুর্বলরাই করে থাকে জানতাম, কিন্তু সিংহ যে নামাবলি গায়ে চড়িয়ে কাজীর কাছে বিচারের জন্যে ছোটে, এ কারও কল্পনায়ও ছিল না।

* * *

জম্মুতে যখন পৌছলাম, বেলা দ্বিপ্রহর। উত্তাপ দেখে মনে হচ্ছিল জম্মুই বুঝিবা পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল অংশ থেকে সূর্যের নিকটতম স্থান। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। তিনি বললেন—সন্ধ্যের দিকে আসবেন, চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

খাওয়া দাওয়া ছেড়ে আগে গেলাম শ্রীনগরের টিকিটের সন্ধানে, আজ বিকেলের টিকিট সব বিক্রী হয়ে গেছে। এখন সেই কাল বিকেলে। বিনা বাক্যব্যয়ে সোনালী মাধ্যম অর্থাৎ golden mean পালন করে মধ্যম শ্রেণীর তিনখানা টিকিট কেটে নিলাম। ভাড়া ১ম শ্রেণী ১৮৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী ১৪॥৹ টাকা, তৃতীয় শ্রেণী ১২৲ টাকা। অবশ্য ভাড়া যদি আরামের তুলনামূলক হয়, তাহলে তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক কম হওয়া উচিত ছিল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, যাঁরা শ্রীনগর যেতে চান, এমন ভাঙা যাত্রা না করে সোজা পাঠানকোট থেকে শ্রীনগর যাওয়াই ভাল, তাতে টিকিট পেতে দু একদিন বেশী দেরী হলেও সুবিধাজনক। একটানা সারভিস চালাবার অনুমতি এখন পর্যন্ত মাত্র একটা কম্পানী পেয়েছে "দি নিউ সুরজ্ ট্রান্সপোর্ট কম্পানী লিমিটেড।"

জম্মু প্রদেশের রাজধানীতে এলাম, কিন্তু বলার কিছু নেই—দেখবার মত কিছু পেলে তবে ত বলা যাবে। রঘুনাথজীর মন্দিরটা বাদ দিলাম না, তবে এর খ্যাতি বোধহয় মাহাত্ম্যে, স্থাপত্যে নয়। শীতকালে শ্রীনগরে অত্যধিক শীত পড়ায় জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজ এখানে এসে বাস করেন। এখানকার মধ্যে বলা যেতে পারে বাস ষ্ট্যাণ্ডটা দেখবার মত জিনিষ। আয়তনে বোধহয় কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে বড়। আর নানা রকম বাস ও লরীতে ভরা। যানবাহনের যে অভাব আছে, এ দেখার পর তা বিশ্বাস করতে গিয়ে চিন্তায় পড়তে হয়।

বিকেল হতেই খুঁজে খুঁজে বার করলাম পথে পাতান হোষ্টের বাড়ী। দেখলাম, সমবয়সী আরও কয়েকজন রয়েছেন। সুরু হয় গল্পগুজব। কিন্তু দেখি গল্প থেকে রাজনীতি বেশী। তবে যা আলোচনা হল তা শুধু মুখরোচক বা একচোখো বিচার নয়, তার যুক্তিপ্রাধান্য আছে।

বলেন—আজ সবার মুখে জম্মুর নাম। সবাই মাথা ঘামাচ্ছে জম্মু নিয়ে, মাত্র কিছুদিন আগেও বিদেশীর মনে এর কোন স্থান ছিল না। কারণ

রাজনীতির খেলা। আজ এই জম্মু, কাশ্মীর আর ভারতের মধ্যে যোগসূত্র রেখেছে। একশ বছর আগের ইতিহাসের কথা মনে পড়ছে। সেদিনও রাজনৈতিক কারণে তার উপযোগিতা বেড়েছিল। পান্‌জাব তখন দুর্দ্ধর্ষ। তার রণকৌশল শক্তিশালী বৃটিশ-রাজকেও ভাবিয়ে তুলেছিল। তখন প্রয়োজন হয়েছিল পান্‌জাবের শক্তিকে খর্ব করা, না হয় তার সমান এক প্রতিপক্ষকে খাড়া করা। তাই ১৮৪৬ সালে জম্মুর গোলাব সিংকে করে দিলেন স্বাধীন জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজ। উদ্দেশ্য হল, বৃটিশের পক্ষ হয়ে পান্‌জাবের বিরুদ্ধে লড়বে। কিন্তু ১৮৪৯ সালে পান্‌জাব ইংরাজের হাতে চলে এলো। তখন তার প্রাধান্য গেল খর্ব হয়ে। তারপর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কাশ্মীরের পথ যখন তৈরী হল, সমস্ত প্রাধান্য গিয়ে পড়ল সেখানে। তা ছাড়া কাশ্মীরের ওই প্রান্তের লাডাক আর গিলগিট—রাশিয়া, আফগানিস্থান ও চীন রাজ্যের প্রান্তে এসে মিলেছে। একশ বছর ধরে যদিও জম্মুর রাজবংশ, সমগ্র কাশ্মীর ও জম্মুর ওপর আধিপত্য করেছে, তবুও জম্মুর কোন প্রাধান্য ছিল না। কারণ ভারতের সংগে যোগাযোগের জন্যে জম্মুর ওপর নির্ভর করতে হত না, তার ছিল না কোন বাফার ষ্টেটের মর্যাদা বা কাশ্মীরের মত আন্তর্জাতিক সীমান্তরাজ্যের গুরুত্ব।

একশ বছর বাদে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল, আবার জম্মুর প্রাধান্য স্থাপিত হল। ১৯৪৭ সালে যেদিন ভারত হল স্বাধীন, আর তার বুক চিরে হল পাকিস্থান, তখন কাশ্মীর পড়ল মহা সমস্যায়। কোন পথে সে পা বাড়াবে? কে হবে তার আপনজন? এর উত্তর দেবার একমাত্র অধিকার দেশের জনসাধারণের। মহারাজ কল্পনা বিলাসের ওপর ভর করে ভাবছিলেন, স্বাধীন সার্বভৌম কাশ্মীর হয়েও হয়ত বেঁচে থাকতে পারে দেশটা। সেই অবসরে পাকিস্থান উপজাতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিল পাকিস্থানী পান্‌জাবের পথে—জোর করে কাশ্মীর দখল করবার জন্যে। এমন কি এই রাজ্যের বেতনভোগী দুজন ইংরাজ কর্মচারী, গিলগিটে অন্তর্বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করেন,

যাতে সহজে কাশ্মীর পাকিস্থানের হাতে পড়তে পারে। তখন দেশবাসী শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে জেগে উঠল—এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ জানাল। ভারতের সহযোগিতায় ১৪ মাস যুদ্ধ করার পর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ তারা পুনরুদ্ধার করল।

পাকিস্থানের জেহাদ ঘোষণা ও অত্যাচার সুরু হবার পর, যে যেখানে পেরেছে পালিয়ে গেছে অসহায়, সম্বলহীন ও আত্মীয় বিচ্ছেদের ব্যথা নিয়ে। ভারত-সরকার কাশ্মীর পুনরুদ্ধার করার পর তাদেরকে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু মীরপুর, ভীমবর, কোটলি ও পুঞ্চ-এর কিছু অংশ, যা এখনও পাকিস্থানের হাতে আছে, সেখানকার বাস্তুহারাদের নিয়ে হয়েছে এক বিরাট সমস্যা।

এক সময় গিয়েছে যখন সমগ্র পুঞ্চ শত্রুপক্ষ ঘিরে ফেলেছিল। সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানকার অধিবাসীরা জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, শাসন নেই—সর্বত্র বিশৃংখলা—সর্বত্র অত্যাচার। সেই দুর্দিনে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে ভারতীয় বিমান বাহিনী। তারা প্লেনে করে সরবরাহ করেছে খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। তাদের আন্তরিক সহযোগিতা, কর্মদক্ষতা ও কর্তব্যপরায়নতা সেদিন সেই বিপন্ন অধিবাসীদের রক্ষা করেছে আর সে দক্ষতা এনে দিয়েছে বিশ্বের সুখ্যাতি। আজও হাজার হাজার হিন্দু, শিখ পাকিস্থান অধিকৃত অঞ্চলে পড়ে রয়েছে ; তাদের জীবন বোধহয় দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে—কেউ কেউ হয়ত পাহাড়ের গুহায়, ঝোপে, জংগলে লুকিয়ে আছে। বলুন, তাদের যে সকল আত্মীয় আজও আমাদের মধ্যে রয়েছে, তাদের মনের কী অবস্থা! প্রিয়জনদের সংগে মিলনের আশায় তারা পাগল! দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য রক্ষার পক্ষে এ অন্তরায়। এর সুষ্ঠু এবং দ্রুত সমাধান হওয়া সকলের পক্ষে প্রয়োজন। আরও কি জানেন, পাকিস্থানের নতুন পলিসি হল, মিত্রপক্ষের ছদ্মবেশে তাদের চর ঢুকিয়ে দেওয়া—তারা ইতিমধ্যে অনেককে

পাঠিয়েছে। কাশ্মীর সরকার কড়া নজর রাখছেন এই সব লোকের ওপর। তাই ত সীমানা পার হবার সময় এত কড়াকড়ি।

ওদিকে আমরা উঠে পড়ার সুযোগ খুঁজছিলাম। রসকসবিহীন এমন রাজনীতি বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। তার থেকে দুট মিষ্টি গল্প হলে মন্দ লাগত না।

* * * *

বেলা ছটার সময় বাস ছাড়ল জম্মু থেকে। তার আগে মালপত্তর ওজন করল, কারণ প্রত্যেককে ২০ সের মাল বিনা ভাড়ায় নিয়ে যেতে দেয়, তার বেশী হলেই মন পিছু ৭।০ করে মালের মাশুল নেয়। প্রথম সারিতেই আমাদের সীট, আমরা তিনজন আর একজন কাশ্মীরী যুবক। তিনি দিল্লীর লাড্ড খান, ছুটী নিয়ে বাড়ী যাচ্ছেন। তাকে দেখতে অনেকটা বাঙালীর মত। ছিপ্ ছিপে গড়ন, লম্বায় মাঝা মাঝি, রঙটা অবশ্য বেশ পরিষ্কার। তাকে বললাম—তোমাকে ত বাঙালী বলে ধরে নিয়েছিলাম।

সে বলে—দিল্লীতে আমার বাঙালী বন্ধু আছে, বাংলায় কথা না বলতে পারলেও বুঝতে পারি সব।

সামনের সীটে ছিলেন একজন কৃষি বিভাগের অফিসার। তিনি বলেন—কোলকাতা থেকে আসছ!

আমরা যেন দর্শনীয় বস্তু। চশমার কাঁচ দুট মুছে নেন, তারপর চোখ দুটো যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করে দেখে নিলেন, তবে অসাধারণত্ব কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হলেন কিনা বলতে পারি না।

তারপর বলেন—সেখানকার অবস্থা এখন কেমন? খুব গোলমাল হয় কী? সাধারণ জীবনযাত্রা কি সেখানে স্বচ্ছন্দে নির্বাহ করা সম্ভব? আচ্ছা এই উৎপাতের মূলে কি সব কমিউনিষ্ট? ইত্যাদি ইত্যাদি। একে কাশ্মীর এখন অপারেশন এরিয়ার মধ্যে পড়ে, তায় আমরা বাঙালী—বোমা ছোঁড়ার জাত—মেপে মেপে কথার উত্তর দিতে হল। না জানি কি

বেফাঁস কথা বলে ফেলি? শেষে কোথাকার জল কোথায় গড়ায়? তাঁকে আশ্বাসের বাণী শোনালাম। প্রমাণ করে দিলাম, আমরা দেবলোকেই আছি, তবে অসুরের অমন আস্ফালন সর্বত্রই হয়ে থাকে। আমাদের সহায় স্বয়ং দেবী—অসুরঘাতিনী, নিরাপত্তাদায়িনী। আর আছে পরম পুরুষ কার্তিকেয়র দল। বর্তমানের কার্তিকেয় আরও দুর্দ্ধর্ষ, কারণ তাঁরা পেখম তোলা ময়ূর ছেড়ে ধরেছেন মাথায় ঝুঁটি দেওয়া ওয়্যারলেস গাড়ী। হাতে ধনুর্বানের বদলে অগ্নিবান।

এবার তিনি বলেন—আমি জানতাম, বাঙালী সংগীতপ্রিয় জাতি, বাঙলা রবীন্দ্রনাথের দেশ, শ্রীগৌরাংগের কর্মক্ষেত্র। তার আকাশ, বাতাস, তার লোকজন যেন কাব্যময়, প্রেম বিগলিত; কিন্তু বৃদ্ধবয়েসে আমার ধারণা সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

বলি—ওলট পালট কেন করবেন? বাংলা কাব্যময়—সে কাব্যে রাধার বিরহ মিলনে চিরদিন জানাজানি, এই সুর যেমন ধ্বনিত হয়, আবার অগ্নিবীণাও ঝংকৃত হয়।

গাড়ী এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ী রাস্তা সরু হয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। একপাশে খাড়াই উঠে গেছে তারার দেশে, অপর দিকটা যেন সমুদ্র গর্ভে। কোথাও সশব্দে ইঞ্জিন গাড়ীটাকে ঠেলে তুলছে মন্থর গতিতে, কোথাও বা নিষ্প্রাণ গাড়ী হু হু শব্দে নেমে চলেছে। এক একটা বাঁক ভয়ংকর। সামান্য অসাবধানে চালালে, আর দেখতে হবে না, কোন অতল তলে···ওঃ! ভয়ে আর চাইতে পারলাম না, আপনি চোখ বুঁজে গেল। তাহলে শরীর পঞ্চভূতে মেশা ত দূরের কথা, আত্মা শুদ্ধু থেঁতলে যাবে। চোখ খুলে দেখি বাঁক পেরিয়ে গেছি। ম্যান এণ্ড সুপারম্যানে বার্ণার্ড শ বলে গেছেন—গাড়ী চড়ার কালে আমাদের জীবনটা ড্রাইভারের হাতে তুলে দেই, তখন তার অনুগ্রহ ও মর্জির ওপর জীবনের স্থিতি বা বিলয় নির্ভরশীল। সে কথার সত্যতা আজ মনে-প্রাণে উপলব্ধি করলাম।

যেখানেই বাঁক আছে তার আগে সাবধান করে দেবার জন্যে বোর্ড আছে। তাতে লেখা Khatra Ahiste Challao, যার মানে দাঁড়ায় - সামনে বিপদ-জনক রাস্তা, আস্তে চালাও; এবং রাস্তাটা যেমন ভাবে বেঁকে গেছে, তার একটা নিশানা আছে। সন্ধ্যার সময় পৌছলাম 'নন্দনি টোলবার'। একটা লম্বা টানেলের মুখে অফিসটা। ৮ মনে ১৲ হিসেবে তারা শুল্ক আদায় করে। তার সামনে এক সাইন বোর্ডে লেখা—

Motor traffic prohibited

3 hours after sunset

And ½ hour before sunrise.

রাত তখন ৯টা হবে, উধমপুরে এসে পৌছলাম। আজ এখানেই রাত কাটাতে হবে। খেয়ে দেয়ে সহর দেখতে বেরোলাম। বর্ধিষ্ণু সহর। এখানে কোর্ট, হাসপাতাল আর জেলখানা আছে। সহর বেশ আলোকিত, কিন্তু রাত্রে দেখবার মত চমক্দার নয়। ঘুরে এসে শুনলাম আজই রাত দুটোর সময় বাস ছাড়বে, তা না হলে রামবানে একদিন আটকে দিতে পারে।

সামনেই এক বটতলায় আশ্রয় নিলাম। কাশ্মীরী বন্ধুটীও এখন আমাদের সংগী। না জানি রাত্রে কত ঠাণ্ডা পড়বে, হাজার হোক কাশ্মীরের গা ঘেঁসা ত, এই ভেবে কম্বল মুড়ী দিলাম। কিন্তু এ অসহ্য গরম। শেষ পর্যন্ত পাতলা চাদরটীও গা থেকে ফেলে দিতে হল। মনে এখন অদ্ভুত ভাবোদয়। সামনে কত রঙীন, চমকপ্রদ দৃশ্য—প্রকৃতির হাতে গড়া মর্ত্যভূমে স্বর্গধাম—তুষার শুভ্র হিমালয় দিয়ে ঘেরা কাশ্মীর—সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতখানি বাঁকা—ঝাউ আর দেবদারু দিয়ে সাজান কুঞ্জবন—ফলেফুলে ভরা দেশের মাটি—কমলদলে ভরা হ্রদ—স্রোতস্বতী ঝর্ণা—তুষারতীর্থ অমরনাথ—সেই পরীর দেশ, দ্বিধায় জড়িত পদ, কম্প্রবক্ষ, নম্রনেত্রপাত, সলজ্জ সুন্দরী—সেই কাশ্মীরে চলেছি।

ওসব ভেবে আর কী লাভ? বরং একটু ঘুমিয়ে নিলে শরীরটা চাংগা

থাকবে। নড়ে চড়ে শুই, কিন্তু ঘুম আসে না। আর সবাই ত নাক ডাকাচ্ছে, আমি হতভাগা জেগে কাটাচ্ছি—এ অসহ্য। ডাকতে লাগলাম—শিশির—এই শিশির—শিশির ?

—তুই এখনও ঘুমস্‌নি ! আমি ভাবছিলাম আমার একারই বিনিদ্র রজনী কাটাতে হচ্ছে।

শেলী দেখে তার কৃতিত্বটা অপ্রকাশিত থেকে যায়, তাই বলে—রাতদুপুরে কী বিরক্ত করছিস্—ঘুমো সব।

আমাদের কাশ্মীরী বন্ধু কিন্তু সাড়া দেয় নাসিকা গর্জনে।

জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। উঠে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত তিনটে। সবাই আমায় ফেলে পালাল নাকি ? না, সবাই ত রয়েছে। ওই ত কাশ্মীরী বন্ধুটীও রয়েছে। উঠে পড়ি. দেখি বাসটা তখনও নিদ্রিত।

তান্‌তাবড়া গুছিয়ে নিলাম। হাঁক ডাক করে ঘুম ভাঙালাম সবার। দেখে মনে হচ্ছিল, তাড়াটা যেন শুধু আমাদের। আর সবাই ব্যস্ত ত নয়ই, বরং আমাদের অত্যুৎসাহে যেন বিরক্ত। যা ইচ্ছে ভাবুক, বয়ে গেল আমাদের।

* * * *

আকাশে আধখানা চাঁদ, তাও বেশ উজ্জ্বল। আমাদের গাড়ী এগিয়ে চলে। উধমপুরের উচ্চতা ২,৩৪৮ ফিট, তারপরই আবার উচ্চতা ক্রমে বেড়ে চলেছে। রাত্রে গরম লাগছিল, এখন ফুরফুরে হাওয়া, ঠাণ্ডার একটু আমেজ—মন্দ লাগেনা। সামনে যিনি আছেন, তাঁর সংগেও জমে গেছে বেশ ! বলেন —শুনেছি বাঙালীর ঘরে ছোট ছোট মেয়েরাও গান জানে, গান বাঙালীর প্রাণ। গানের দেশে তোমাদের জন্ম, অথচ তা জান না—এ কথা বিশ্বাস করতে পারিনা।

হায় ! কি করে বোঝাই যে সে রসে আমরা বঞ্চিত। ছেলেবেলায় হারমনিয়ম ধরা ত দূরের কথা, ভুঁইফোঁড় বিদ্যায় শেখা কোন গানের কলি যদি

অসাবধানে বাড়ীর গুরুজনদের কানে গিয়েছে ত, নিজের কান আস্ত থাকত কিনা সন্দেহ। পাড়ার লোকেরা দেখলে, সম্ভাষণ জানাত লক্কা পায়রা বলে। মাষ্টারমশাই জানতে পারলে, পড়া না পারার অপরাধটা হয়ে যেত চতুর্গুণ বেশী। অবশ্য বিদ্যাবন্ত হবার পর, যখন আমরা স্বাবলম্বী হই, বলার কেউ থাকেনা সত্যি—কিন্তু ওই বুড়ো বয়েসে, হেঁড়ে গলায় সারগাম ভাঁজতে সুরু করলে, পাড়া-প্রতিবেশীরা সারি বেঁধে পিঠে তবলার তাল দিতে কসুর করবেনা। তারপর আবার সংসারধর্ম আছে, চাকরী আছে, রেশন আছে, আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, ছেলের অসুখের জন্তে কোব্‌রেজী অনুপানের বহর আছে—এরকম ছোটখাটো আরও কত কি। তবে গানের একমাত্র অবসর নাইবার ঘরের সময়টুকু। তখন হয়ত মনের দুঃখে গেয়ে ফেলি—

তার মনের বনে লাগল আগুন

ফাগুন হাওয়া বয়না,

দীনকে দয়া হয়না।

অবশ্য সময় অসময় নেই, পাড়ার অ্যামপ্লিফায়ার গাঁক্ গাঁক্ করে গান শোনায়; আর পাশের ফ্ল্যাটের আভিজাত্যের আড়ম্বর প্রকাশের নমুনা স্বরূপ, ভলিয়ুম বাড়ান রেডিওর গান কানের পর্দায় ধাক্কা দেয়। তখন তাদের জাহান্নামে পাঠালেও, নিজের আজ্ঞাতেই অনেক গান ও সুর মনে গেঁথে গেছে। সেই শিক্ষা নিয়ে, ভাঙা কলি আর বিকৃত সুর দিয়ে তিনজনে কোরাস সুরু করলাম—ছুটল গানের ককটেল—পবিত্রতা না থাকলেও, মাদকতা আছে।

ফুর্তি বেশীক্ষণ টিকল না। ঠাণ্ডাটা যেন একটু বেশী বেশী বলে মনে হচ্ছে। বাসের জানলাগুলো তুলে দিয়ে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে বসলাম। একে একে ধরমথাল ছাড়িয়ে গেল। এগিয়ে চলেছি হু হু শব্দে। নাঃ, লজ্জা শীতকে বাগ মানাতে পারল না। এ যেন হাড় শুদ্ধু কাঁপিয়ে দিচ্ছে। উঃ! কী শীত—কী ভয়ংকর তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা! সবার গায়েই কিছু না কিছু আত্মরক্ষার

সরঞ্জাম ছিল, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, রাতে অত গরমের পর, ভোরে এমন হাড়-মড়-মড়ে শীতের কবলে পড়তে হবে। ট্রাংক, বিছানা সব বাসের মাথায় চাপান, একজনের মালের ওপর আর একজনের মাল চাপিয়ে তার ওপর ত্রিপল চাপা দিয়ে ম্যাজিনো লাইন করে বাঁধা। সুতরাং সেই ব্যূহ ভেদ করে গরম পোষাক বার করতে হলে এক ঘণ্টার ধাক্কা। অতখানি ত্যাগস্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। কী দুঃখ! মাথার ওপর রয়েছে আমার নিজস্ব গরম পোষাকের গন্ধমাদন পর্বত, আর আমি শীতে থরহরি কম্পমান। আমাদের কাশ্মীরী বন্ধু দেখি একখানা কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে। মাথায় থাকুক আধুনিকতার চক্ষুলজ্জা—প্রাণ বাঁচলে তবে ত বৈরাগী। কম্বলটা ভাগাভাগি করে নিয়ে সে যাত্রা রক্ষা পেলাম। প্রায় ছ-হাজার ফিট উচ্চ পর্বতমালা পেরিয়ে এলাম।

ব্যাটোট যখন পৌছলাম, সকাল হয়ে গেছে। জম্মুতে পৌছে ঠাণ্ডি ঠাণ্ডি পানি খুঁজেছিলাম, এখন গরম গরম কিছু চাই, হাত পা সব কালিয়ে গেছে। চায়ের সন্ধানে বেরোলাম। সারি সারি দোকান রয়েছে, তবে সবগুলোই যেন অগোছাল; তারই একটায় ঢুকলাম সবাই মিলে। অমনি ওদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল—কেউ একখানা কাঠ এনে অনর্থক উনুনে গুজে দেয়; কেউবা ময়দা নিয়ে মাখতে বসে, একজন হঠাৎ এসে পুরো একঘটি জল তার মধ্যে ঢেলে দিল। যেন একটা বিরাট কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি হল, অথচ কাজ এগোয় না সামান্য মাত্র। শেষে নিজেদের মধ্যে বাকযুদ্ধ ও হাত-থাকতে-মুখে-কেন সুরু হল এবং তার পরম পরিস্থিতি হল অভিমানের অশ্রুবন্যা। যাইহোক প্রাতঃকালীন পিণ্ডের আশায় বিচারকের দণ্ড হাতে নিতে হল। অনেক কষ্টে তাদের কলহের আগুনে ছাই চাপা দেওয়া গেল এবং চা জল খাবারও তৈরী হল। আর এক বিপদ দাম দিতে গিয়ে, কত দাম হবে তা আর কিছুতেই হিসেব করে উঠতে পারে না।

এরা কেউ ব্যবসায়ী নয়, পাকিস্থানী কাশ্মীর থেকে এসেছে, সরকারী

সাহায্যে খুলেছে দোকান। কেউ বা জমি চাষ করত, কেউ বা বুনত শাল, কেউ পেশমন। হঠাৎ সাহায্য ও পুনর্বসতি দপ্তরের সৌজন্যে, যেন তেন প্রকারেন একটা হিল্লে করে দেওয়া হয়েছে—তা হাল ধরতে পারুক আর নাই পারুক।

এদিকে বাস আর সাড়াশব্দ করেন না। ড্রাইভার গেল নাট বল্টু পরীক্ষা করতে। এই ক মাইল পথ আসতে সকল গাড়ীই দুচারবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। আবার সেবা যত্ন পেয়ে চাংগা হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ী গর্জন করে ওঠে।

সামান্য দূরে গিয়ে গাড়ীটা থেমে গেল, আবার কি গাড়ী বিকল হল নাকি?

না, দেখি পাশেই একখানা বাস চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে। আমরা যে কম্পানীর গাড়ীতে চলেচি, এ তাদেরই গাড়ী, আমাদের আগের দিন ছাড়ে। শুনলাম কয়েকজন যাত্রী নাকি বেশ আহত হয়েছে, তাঁরা রামবান মিলিটারী হাসপাতালে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেদিনের টিকিট পেলে বরাতে কি দেখা হত, কে জানে? তীরটা কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

জম্মু কাশ্মীরে যারা গাড়ী চালায়, খুব এক্সপার্ট ড্রাইভার। ঢালের মুখে তারা ৩০।৪০ মাইল স্পীডে গাড়ীগুলো এঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিয়ে যায়—এ যেন তাদের কাছে জলবৎ তরলং। তবুও প্রায়ই এ পথে দুর্ঘটনা ঘটে। তার কারণ আছে। প্রথমতঃ ড্রাইভাররা তেল বাঁচাতে চায় পুর মাত্রায়। যখনই তারা ঢালু রাস্তা পেল, অমনি চাবি ঘুরিয়ে গাড়ীর মেশিন বন্ধ করে দিয়ে নিউট্রাল-এ গাড়ী চালায়। কাজেই যখন প্রয়োজন মনে করে, ব্রেক কস্‌লে অত সহজে থামে না। তাছাড়া নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই, এক নাগাড়ে দু-তিন দিন ধরে গাড়ী চালায়। তখন তাদের মূর্তি দেখলে বোঝা যায় অ্যাক্‌সিডেন্ট করা খুব অসম্ভব নয়।

আমাদের বাসটা এগিয়ে চলল। ভাল লাগেনা আর, সেই পাহাড় আর পাহাড়, একঘেঁয়ে—নতুনত্ব নেই। মনে হচ্ছে, এই পাহাড় যেন কতদিনের পরিচিত, আবাল্য সংগী। এর রূপই বা এমন কি? একটা রুক্ষ, নগ্ন, শালীনতাহীন পরিবেশ—কী জংলী।

কাশ্মীরী সংগীটী বলে—ব্যাটোট আর রামবানের মধ্যেই কোন এক অন্তরীক্ষে আছে গজপত দুর্গ—চন্দ্রভাগা নদী দিয়ে ঘেরা। কাশ্মীরী অপরাধীদের দ্বীপান্তর দেওয়া হয় সেখানে। আরও বলে—ব্যাটোট ও রামবানের জলবায়ু খুব লোভনীয় এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। ব্যাটোটে যক্ষারোগীদের একটা স্যানেটোরিয়াম আছে। দু'ট জায়গাই হার্ট ট্রাবল্‌সের পক্ষে খুব ভাল।

আমি বলি—কয়েদীদের 'হার্ট চেঞ্জ' করার জন্যেই ত ওদের এখানে রাখা।

সবাই হেসে ওঠে মন্তব্য শুনে।

*   *   *   *

গাড়ী থেমে গেছে। সামনে এক বিরাট 'কনভয়'। রামবান এসে গেছে। গাড়ী থেকে নেমে এগিয়ে চললাম। দেখি মাইল খানেকের ওপর গাড়ীর লাইন লেগেছে। একখানা গাড়ী ব্রিজের ওপর ছেড়ে দিল, আস্তে আস্তে পার হয়ে গেল। যতক্ষণ সে গাড়ীটা অপর পারে না পৌছচ্ছে ততক্ষণ অন্য গাড়ী তার ওপর চড়তে দেওয়া হয় না, যাত্রীদের হেঁটে পার হতে হয়। ব্রিজের কোথায় নাকি ফাটল ধরেছে, তাই এই সাবধানতা।

ব্রিজটা পার হয়ে একটা লম্বা পাথরে চেপে বসলাম। কী সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। মন নেচে উঠলো। ক্যামেরাটা বার করলাম, ভাবছি ফটো তুলি, আবার ভয়ও হচ্ছে, কি জানি যদি ধরে এসে। একে যুদ্ধ চলেছে, তায় এতে সমর প্রাধান্য আছে। শেলী বলে—চ জিগ্যেস করে আসি।

তাই ভাল। গেলাম সেখানকার Officer-in-Charge-এর কাছে। বলে—তোমরা ফটো তুলেছ?

—না, তুলতে কোন আপত্তি আছে কি না, তাই জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

—উত্তর দাও। বল তুলেছ কি না ?

কোর্ট মার্শাল সুরু হয়ে গেল নাকি ?

বলি—তোলবার জন্যে অনুমতি নিতে এসেছিলাম, তোলা হয়ে গেলে নিশ্চয় এর প্রয়োজন হত না।

আবার চার্জ—সত্যি করে বল তুলেছ কি না ? ক্যামেরা নিয়ে এস আমার সংগে।

এইরে ? কোয়াটার গার্ড নাকি ? এ যে ডেকে ঘরে শাল ঢোকান। সত্যি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। সবে কেনা এই মূল্যবান ক্যামেরাটি খেসারৎ দিতে হবে ? কি জানি, আবার শ্রীঘরে না নিয়ে যায় ? বিশ্বাস নেই কিছু। মিলিটারী খপ্পরে পড়া, আর ক্ষুধিত বাঘের খাঁচায় পুরে দেওয়া, বোধহয় এক জিনিষ। শেষে কাশ্মীরী বন্ধু আর কৃষি বিভাগের অফিসারও গেলেন আমার পক্ষ হয়ে মধ্যস্থতা করতে। বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে যখন দেখলাম, শেলীর হস্তস্থিত 'প্লেয়ার্স প্লীস' জ্বলন্ত অবস্থায় জংগী-বাহাদুরকে প্লীস করছে তখন নিশ্চিন্ত হলাম। এই প্রসংগে একটা গল্প মনে পড়ে গেল—রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বসেছে বিলেতে, ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হবে। কোন বিষয় স্থির করার ভার পড়েছে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর ওপর। ওদিকে সেই কন্‌ফারেন্সের মুসলিম ডেলিগেট দেখেন, নির্ধারিত প্রস্তাবটী তাঁর দলের স্বার্থবিরোধী। এ তিনি হতে দিতে পারেন না, মতলবও এঁটে ফেললেন মনে মনে, কাজ হাসিল তাঁকে করতেই হবে।

তিনি জানতেন তেজবাহাদুরের দুর্বলতা। পার্টি দিলেন বাড়ীতে। মুসলমান খানসামা দিয়ে রাঁধলেন মুখরোচক মুরগির মাংস ও পোলাও। খেয়ে খুব তৃপ্তি লাভ করছেন তিনি। এমন সময় এল প্রস্তাবনা। কী করেন ? এমন পরিতৃপ্তির সময় কি করে করেন প্রত্যাখ্যান—এমন মধুর আবহাওয়াকে পরিণত করতে হবে বিষাক্ত পরিবেশে ! উঁ-হুঁ, তাকি সম্ভব ! তাতে সায় দিয়ে এলেন।

জয় হল চিকেন আর পোলাওর। ভেবেছিলাম বলে ফেলি গল্পটা, শেষে রসনাকে সংযত করতে হল মিলিটারী মেজাজের ভয়ে।

এপারে একটা সাইনবোর্ড আছে, তাতে লেখা :

Stop	Tharo
Await Signal	Isarake Lie Integar Karo
Engage Buttom Gear	Buttom Gear me Lagaon
Speed Limit 4 Miles.	Raftar 4 Mil Fi Janta,

অবশ্য ওটা প্রকাশ্যে লিখে নেবার মত বুকের পাটা আমার তখন ছিল না। মুখস্ত করার মত স্থিরতাও থাকা সম্ভব নয়। তাই বন্ধুকে বললাম ও ভারটা নিতে।

এবার রাস্তাটা বড় খারাপ। ভাঙা চোরা, আর ধুলোয় ভর্তি। উচ্চতা ব্যাটোট থেকে কমতে সুরু করেছে। এখানে উচ্চতা প্রায় দু-হাজার ফিট। এর পরই আবার সুরু হয়েছে চড়াই এবং শেষ হয়েছে ৯ হাজার ফিটে। কয়েক মাইল দূরেই দেখলাম নতুন করে একটা ব্রিজ তৈরী করা হয়েছে। এইটেই বিখ্যাত খুনীনালা। এর পাশেই এক বিরাট উঁচু পাহাড়। কাশ্মীরী বন্ধু বলে—বহুবার গড়তে হয়েছে এই পথটি, আবার একখানা ছোট নুড়ী প্রলয় এনেছে মানুষের বিপুল উদ্যমে। এ সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কাহিনী আছে, শুনবেন নাকি?

—শুনব না কি বলছেন, বরং না বললে ছাড়ছি না।

তিনি সুরু করেন—সে বহুযুগ আগের কথা, তখন এখানে এমন প্রশস্ত রাজপথ ছিল না, বরং ঝর্ণাটী ছিল চমৎকার। তার ওপর বাঁধ দিয়ে প্রকৃতিকে লোকে বিকৃত করবে, সে তখন কল্পনায়ও ছিল না। একটী ছেলে, নাম মোহন, দরিদ্র রাখাল ছেলে। সারাদিন মেষ চরাত মাঠে, সন্ধ্যার পর সবাই যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবার জোগাড় করত, সে বাঁশী নিয়ে এই ঝর্ণার তীরে এসে তুলত

সুরের লহরী—কী মিষ্টি তার সুর—কত করুণ, কত স্নিগ্ধ, কত মনোলোভা। কেউ কেউ জানত তাকে; আর যারা জানত না বলত, এ কোন অশরীরী দেবদূত, মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে সে এমন সুমধুর আহ্বান ছড়িয়ে দিয়েছে। ভুলেও যদি কেউ সেখানে গিয়ে পড়ে, ফিরবার আর শক্তি থাকবে না। ফলে যারা তাকে জানত, দোটানার মধ্যে পড়ে ভাবত, হয়ত তাদের ধারণাই ভুল; এ মোহনের সুর নয়, অন্য কোন স্বর্গীয় মহিমা এর মধ্যে আছে। আর এমন সুমধুর সুর মানুষের কণ্ঠে কখন কি সম্ভব?

শুধু কৌতুহলের বশে মানুষ প্রাণের মায়া ভুলে যায় কি না জানি না; তবে বোধহয় কেবল কৌতুহল নয়, আরও কোন গভীর আকর্ষণ লীলাকে নিয়ে গেল সেই সুরলোকের সন্ধানে। এই সুরকে সে ভালবেসেছে, এর উৎস যেন তার জীবনের প্রেরণা, এর লহরী যেন তার প্রাণের উত্তেজনা, এর তান লয় যেন তার জীবনের আশা, আকাংখা, সাধনা। তাই একরাত্রে বাড়ীর সবাই যখন নিদ্রিত, রাজকন্যা লীলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় বাড়ী থেকে। একে একে ঝর্ণার ধারে গিয়ে পৌছয়। দেখে কই দৈত্য ত নয়—যেমন মিষ্টি সুর সে এতদিন ধরে শুনেছে, তেমনি মিষ্টি এর রূপ—নধর কান্তি, মুখে স্নিগ্ধ পবিত্রতা। কোন দিকে নজর নেই, আনমনে সৃষ্টি করে চলেছে পবিত্র দেববিনিন্দিত সুর। লীলা প্রাণভরে শোনে সেই গান আর পান করে তার রূপসুধা। শুধু বাঁশীর সুর নয়, এর স্রষ্টাকেও বোধ হয় সে ভালবেসে ফেলেছে! ভয়, সংকোচ এসে মন অধিকার করে; ফিরে চলে যায়, মোহন কিছু জানতেও পারে না।

সেইদিন থেকে যখনই এই বাঁশী বেজে ওঠে, লীলার মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঘরে আর মন বসে না, ছোটে সেই ঝর্ণার পথে। শুধু শব্দসুধা নয়, রূপ সুধাও সে পান করবে। সেদিন পূর্ণিমা, চাঁদের প্রাণমাতানো আলো ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে—আকাশে ভেসে চলেছে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ—ঝর্ণার পরিষ্কার জল তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে—বসন্তের মাধবীমঞ্জরী ছড়িয়ে যাচ্ছে সুবাস—

নাম-না-জানা কত গাছ মৃদু হিল্লোলে প্রাণে এনে দিচ্ছে নৃত্যের ছন্দ। প্রকৃতি যেন এদের পাগল করে দেবে। এই জ্যোৎস্নালোকের পুলক এনে দিচ্ছে পরম ব্যাকুলতা। সে আজ মনে প্রাণে অনুভব করছে গভীর স্পন্দন—আনন্দের স্পৃহা—মিলনের আকাংখা।

কপোত ও কপোতী ছিল বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। দুজনের দেখা যখন হল, উড়ে এল বৃক্ষের একই শাখায়—থাকবে তারা মুখোমুখি, কাছাকাছি। কথা নাই বা ফুটল, চোখে তাদের ভালবাসার ভাষা, নীরব তাদের প্রেম। মোহন উঠে এল ধীরে ধীরে, তার হাতের ওপর রাখল হাতখানি, এককোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল তার হাতে—নীরবে নিভৃতে হল ভাবের আদান প্রদান—হল মন দেওয়া নেওয়া। লীলা তার সুকোমল হাতখানি সম্পূর্ণ সমর্পণ করে তার হাতে, সে যেন চায় পরিপূর্ণ আশ্রয়, নীল নয়ন পদ্ম নিমীলিত হয়ে আসে, মুখখানি তার বক্ষে এসে আশ্রয় নেয়—বিশ্বের সকল শান্তি যেন এর মধ্যে, এ যেন সকল সুধার আকর। মোহন সযতনে তুলে ধরে মুখখানি, তাকে আরও কাছে পেতে চায় দিতে চায় তার প্রেমের প্রতিদান······অধরে অধরে মিলন, অলকে অলকে, কোথা পুলকের তুলনা—সোহাগে ভরিয়ে দিতে চায় তার মুখখানি, তার মন-প্রাণ।

রাতের পর রাত সবার অলক্ষ্যে চলে তাদের প্রেমের অভিসার। সারা দিন ধরে তারা অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করতে থাকে ওই সময়ের আশায়—কখন হবে রাত, কখন হবে তারা মিলিত। এ শোনায় সংগীত, বিনিময়ে সে দেয় সদ্যবিকশিত সুকুমার পদ্মটী, তার রূপ, তার যৌবন, তার নারীত্ব। নিজের সব কিছু সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দিয়ে যেন লীলার শান্তি, তার জীবনের সার্থকতা। মোহনও তার ভালবাসা দিয়ে—রূপে, রসে, গন্ধে তার জীবন-যৌবন ভরিয়ে দেয় কানায় কানায়। এর বেশী সে জীবনে কিছু চায় না, এর বেশী আকাংখা ওর জীবনে নেই। এই ত জীবন—এই ত স্বর্গ!

হঠাৎ দেখা দিল প্রকৃতির করাল রুদ্রমূর্তি, দেখা দিল ঝড়, ঝঞ্ঝা, তুষারপাত—দুরন্ত নৃত্যের তাণ্ডবে কপোত কোপোতীর নীরব নিভৃত বাসা গেল ভেঙে,

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরস্পর। প্রকৃতি তাতেও সন্তুষ্ট নয়, শীতে, অনাহারে, মনবেদনায় তারা বিদায় নিল চিরসুন্দর পৃথিবীর বুক থেকে।

ধরা পড়ে গেল লীলা। রাজা জানতে পারলেন তাঁর কন্যার প্রেমের কথা, অভিসারের কথা, আত্মদানের কথা। রাগে তিনি জ্ঞান হারালেন। কি স্পর্ধা! রাখালের ছেলে চায় রাজকন্যা, পথের ভিক্ষুক চায় রাজসিংহাসন অলংকৃত করতে, বামুন হয়ে চাঁদে হাত! এর উপযুক্ত শাস্তি তাকে দিতে হবে—সে যেন তিলে তিলে বুঝতে পারে, কত বড় বেয়াদপি সে করেছে। তাকে পিশে কুঁকড়ে মেরে ফেললেও বোধহয় তাঁর রাগ যাবে না। তাকে জ্বলন্ত আগুনে ফেললেও বোধহয় তাঁর মনের আগুন কমবে না। দেবপূজার ফুল কিনা বানর পদদলিত করেছে। আদেশ দিলেন, তাকে ধরে এনে সেই ঝর্ণার ধারে বাঁধা হবে এবং চতুর্দিক থেকে সবাই ঢিল ছুঁড়ে তাকে হত্যা করবে। আর তার চোখের সামনে ওই উঁচু পাহাড়ের ওপর থাকবে রাজকন্যা, যেন সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুঝতে পারে, কত বড় তার অপরাধ—যে কন্যা রাজা মহারাজের যোগ্য, তাকে সে অপবিত্র করেছে।

মোহন শান্ত; যেন কিছুই ঘটে যায়নি তার জীবনে, নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্যে। এদিকে লীলার চোখ দিয়ে দর দর ধারে পড়ছে অশ্রু; এই শাস্তির মূলেত সে-ই, অপরাধ ত তার, কেন এই পোড়া চোখ একদিন তাকে না দেখতে পেলে চঞ্চল হয়ে উঠত, শুধু ভালবাসায় কেন ভরেনি মন, তার অমিয় পরশের লোভে কেন রোজ ছুটত সেখানে।

মোহনের এখন কোন দুঃখই নেই, লীলা ত তাকে ভালবাসে—তাদের প্রেম ত অমর—স্থূল দেহের মিলন আর নাই বা হল! কেবল দুঃখ হয় এই ভেবে, বাঁশীটা যদি পেতাম যাবার আগে, তাকে শুনিয়ে যেতাম প্রাণের শ্রেষ্ঠ গান, আমার জীবনের শেষ দান—লীলার সব থেকে বড় আনন্দের জিনিষ ছিল এই বাঁশীর সুর··· আর ভাববার অবসর পায় না, রাজা হুংকার ছেড়ে নির্দেশ দিলেন হত্যা করার। চারিদিক থেকে পাথর এসে বিঁধতে লাগল তাকে, তবুও সে ধীর,

স্থির। তার ধীরতাই বোধহয় লালাকে পাগল করে দেয়—তার মনে হয়, পাথরগুলো যেন তারই গায়ে এসে পড়ছে ; আঘাতের ক্ষত থেকে রক্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে—লীলার ধমনীতে বইছে সে রক্তস্রোত। কিন্তু সে যে অসহায়, কি করতে পারে? এই পাহাড় থেকে লাফিয়ে আত্মবিসর্জন দিতে পারে, তাই কি সে করবে? হঠাৎ নজরে পড়ল, এক বিরাট পাথর সামান্য অবলম্বনের ওপর রয়েছে, একটুখানি সাহায্য করলে সে পড়বে নিচে—সে মরবে, মোহনের যন্ত্রনার অবসান হবে, আর মরবে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন নরঘাতকের দল। ছুটে যায় সেখানে, আপ্রাণ শক্তিতে ঠেলে একটুও নড়াতে পারে না, আবার চেষ্টা করে, তাও বৃথা যায়। এদিকে রাজসৈন্য তা দেখতে পেয়ে ছুটে আসে অঘটন রোধ করতে কিন্তু পাথরের বুকেও ভালবাসার আঘাত বেজে ওঠে—লীলা সফল হয়, প্রতিরোধ করার আগেই সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

লোকে বলে, চাঁদনী রাতে কোন কোন সময় এখনও শোনা যায়, সেই বাঁশীর সুর ; রাজকন্যা আজও নাকি ঘুরে বেড়ায় এই পাহাড়ের বুকে, যখনই তার মনে হয় মোহনকে রাজপুরুষেরা হত্যা করছে, ফেলে দেয় এক এক খানা বিরাট পাথর।

* * * *

বেলা পড়ে এসেছে। মৃদুমন্দ আবহাওয়া। গাড়ী উঠছে ত উঠছেই—কি জানি, কোন শূন্যে এর সমাপ্তি। হয়ত পাঁচ সাত মাইল ঘুরে আসার পর দেখলাম, আগের পথের সমান্তরাল ভাবে চলেছি। এ যেন কুণ্ডলী পাকান অজগর সাপ। একই পাহাড়ের গায়ে পাঁচ সাত বার সমান্তরাল ভাবে চলে-গেছে। এমনি ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথে উঠতে হয়। শ্রীনগর থেকে ৬৩ মাইল আগে উচ্চতা পেলাম প্রায় ৯,০০০ ফিট, সেখানে প্রায় দুশ গজ লম্বা এক টানেল—পাহাড়ের গহ্বরে অন্ধকূপ সদৃশ পথ। গাড়ী হেড লাইট জ্বেলে গুড়্ গুড়্ করে এগিয়ে যায় গহ্বরের ভেতর দিয়ে। একি? হঠাৎ চোখের

সামনে খুলে গেল এক অপূর্ব দৃশ্যপট। নিপুণ শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা একখানি নিখুঁৎ ছবি—অয়ি ভুবনমনোমোহিনী—কী রূপ—কী মাধুরিমা। কাশ্মীর উপত্যকা ভেসে উঠল চোখের সামনে। সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, ধাপে ধাপে নেমে গেছে। গাছগুলোর এমনই আকৃতি, যেন মনে হয়, কোন মালি নিয়মিত ছেঁটে দিয়ে যায় গাছগুলো। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলাম, আমাদের চিরবাঞ্ছিত ভূস্বর্গ।

কাশ্মীরী বন্ধুটী বলে—আর দু-মাস আগে এলে দেখা যেত রঙ-বেরঙের ফুলে ভরে আছে চতুর্দিক। বনফুল, কিন্তু কী শোভা। সে যেন বিশ্বসুন্দরের প্রতীক—স্বয়ং মূর্তিমতী মনোলোভা প্রকৃতি দেবী।

হু-হু শব্দে এগিয়ে চলেছি উপত্যকার দিকে। আরও আশ্চর্য লাগে, দূর থেকে যা ঘাস বলে মনে হয়েছিল, দেখলাম সেগুলো ঘাস নয়, কোথাও বা গম, কোথাও বা ধান ফলে রয়েছে।

কাজীকুণ্ডে এসে পৌছলাম সন্ধ্যার সময়। শ্রীনগর এখনও ৪৬ মাইল দূর। উপত্যকার সমভূমি সুরু হল এখান থেকে। এত বড় উপত্যকা পৃথিবীতে বিরল—লম্বায় ৮৪ মাইল, চওড়ায় ২৪ মাইল।

গাড়ী এবার এগিয়ে চলে বীথিকার ভেতর দিয়ে। মনেই হয়না যে পাহাড়ী দেশে এসেছি। ৫,০০০ ফিটের ওপর দিয়ে চলেছি, কিন্তু এমন সমতল যে মনে হয়, এ যেন বাংলা দেশ। রাত তখন সাড়ে নটা, গাড়ী এসে থামল শ্রীনগরের বুকে। পথের শেষে পথের সাথীকে বিদায় দিলাম। সামনেই ধর্মশালা। রাত্রের মত সেখানে আশ্রয় নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাল দেখা যাবে কোথায় থাকা সুবিধাজনক।

*　　*　　*　　*

ধর্মশালা নামের উৎপত্তির সন্ধানে ঘুরছিল মন। বোধ হয় ধর্মকর্ম করতে এসে যাদের সাময়িক ভাবে থাকবার প্রয়োজন হয়, তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা। তাহলে নিশ্চয় আমাদের থাকবার অধিকার সেখানে নেই। কিন্তু [illegible]

করতে পারি, ধর্মের ভাম করা ত বিশেষ দুরূহ ব্যাপার নয়। কিন্তু সকল ব্যাখ্যাই ভুল হয়ে গেল, এ শালায় নতুন করে আশ্রয় দেবার স্থান নেই, বাস্তু-হারাতে ভরা।

বলে—ঘর ত দূরের কথা, কুরুক্ষেত্র বাধাবার হুমকি দিলেও বারান্দার সূচ্যগ্র মেদিনীও পাবেনা।

রাতটুকু কোন রকমে কাটালে, সকালে দেখেশুনে নেওয়া যেত, কিন্তু তা আর হল না। অবশ্য অগতির গতি হোটেল ত আছেই, তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলাম। বন্ধু ভাগ্য সুপ্রসন্ন। একজন উপযাচক হয়ে জিজ্ঞাসা করে আমাদের পরিচয়। বলে—দেখি আপনাদের জন্যে কি করতে পারি? কোথায় থাকতে চান? হোটেলে না হাউস বোটে?

বললাম—খুঁজছি বামুনের গরু। খাবে কম, দুধ দেবে বেশী।

বলে—হোটেলে একখানা ঘরের ভাড়া দু-টাকা থেকে আরম্ভ করে ঊর্ধতন পুরুষে চলে গেছে, আর মিলচার্জ বড় বেশী। হাউসবোটে আপনারা গেলে, নিকৃষ্টটিতেও মাথা পিছু দৈনিক সাত আট টাকার কম দক্ষিণা নিয়ে ছাড়বে না। অবশ্য এবার কোন যাত্রী নেই, তাই অভাবে [illegible] মনোবৃত্তি হয়েছে। একজন আমায় আজ হাউসবোট ভাড়া [illegible] জন্যে ধরপাকড় করছিল, দিনে মাত্র দু-টাকা পেলেই সে রাজি।

—আমরা কি গররাজি?

কাশ্মীরে এসেছি, হাউসবোটে না থাকলে ত আসাই বৃথা।

আগে ভয় ছিল, না জানি তার কত গগনচুম্বী চাহিদা। কিন্তু সে আজ ভিখারিণী সেজে আমাদের কাছে এসেছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে! গেলাম বটে, তবে তার আভিজাত্যটা খাটো হয়ে গেল আমাদের দৃষ্টিতে—চার্মটা যেন নষ্ট হয়ে গেল। হাইব্রাউ স্নব আজ লো ব্রাউ সুপ্পেন। শেষে মনকে সান্ত্বনা দিলাম, ভিখারী হলেও সে সম্ভ্রান্ত সমাজের, বংশ গৌরবে সে বনেদী। দিন চার টাকায় রফা হল। রান্নাবাড়া, ফাই-ফরমাস থেকে ঘরদোর পরিষ্কার, সব তার হাতে।

অর্থাৎ হোমডিফেন্স থেকে সুরু করে ফুড., সাপ্লাই, এমন কি মিউনিসিপ্যালিটীর আবর্জনা বর্জন, সবতাতে তার একচ্ছত্র অধিকার। মালিক মহম্মদের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলাম।

হাউসবোট, বাংলায় বলা যেতে পারে নৌকাগৃহ…উঁ-হুঁ, তরণী-নিকুঞ্জ বললে মানাবে ভাল। প্রথম ঘরখানি বৈঠকখানা, মেঝেয় কার্পেট পাতা, একখানা ছোট টেবিল, আর খানকয়েক কোচ। দেওয়ালে কয়েকটা বাঁধান ছবি, অবশ্য তা বেনজানটাইন, কেল্‌টিক বা উত্তর অবনীন্দ্রনাথ আর্টের নিদর্শন নয়, তবে ক্ল্যাসিকের আবরণ দিয়ে বলা যেতে পারে আলোছায়ার খেলা—গ্রীক শিল্পের অনুকরণে অংগ-সৌষ্ঠবের প্রকাশ, ম্যুড্ ষ্টাডি। ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করলাম, যদি লোকের কাছে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, এই আশায়।

পরের ঘরখানা ভোজনালয় বললে ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়না, সেখানা ডাইনিং রুম। জিনিষপত্তর দেখে বিশ্বাস হল, যে এখানে একটী ছোট খাটো ডিনার পার্টি দেওয়া যায়। পরের দুখানা শোবার ঘর। তাছাড়া বাথরুম, পায়খানা, এমন কি খোলা চত্বরে বসে নদীর হাওয়া খাবার ব্যবস্থাও আছে। সব ঘরেই ইলেকট্রিক লাইট। থাকবার জয়গা দেখেই মনে হচ্ছিল কষ্ট করে আসা সার্থক হয়েছে। এবার বন্ধুটীর কাছে ফিরে এলাম। সে ওঠবার জন্যে উস্ খুস্ করছে, অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি তাকে। আধুনিকতা বিরুদ্ধ হলেও তার পরিচয় জানতে চাইলাম। শ্রীজিতেন্দ্রলাল ডোগরা, অংকে অনার্স পাবার পর বি. এল. পাশ করেছেন। এখন কাশ্মীর ষ্টেটে চাকরীর তদবির করার জন্যে আগমন।

বললাম—বিজ্ঞান পড়ে আইন? রাজনীতিতে মাথা গলাবেন নাকি? ডোগরা অঞ্চলের শেখ আবদুল্লা হতে চান? তিনি রসায়ন শাস্ত্র পড়েছিলেন বটে, তবে আইন পড়েননি।

তিনি বলেন—শুধু এক তরফা আমাদের ঘাড়ে দোষ দিলে চলবে কেন?

আপনাদের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রী প্রফুল্ল ঘোষ বিজ্ঞানসেবী, বর্তমানের বিধান, তিনি ত জাতির নাড়ী দেখেন, স্বয়ং পণ্ডিতজীও রয়েছেন বিজ্ঞানের ছাত্র।

আমি বলি—তার থেকেও আশ্চর্যজনক বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। আমাদের নোটের রাজা দেশমুখ, তিনি বোটানিষ্ট, পরে হলেন ব্যাংকার, অতঃপর মন্ত্রীর গদী আঁকড়ে ধরলেন। তবে বৈজ্ঞানিক হয়েও রাজনীতি ক্ষেত্রে যিনি সকল যুগের বিপ্লবীদের শ্রদ্ধেয়, তিনি হলেন—ডি ভ্যালেরা। অদ্ভুত তাঁর জীবন। ছোটবেলায় তাঁকে ক্লাসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন খোঁজ সুরু হল। শেষে দেখা গেল, গভীর মনোযোগ দিয়ে উর্ধতন শ্রেণীতে অংকের ক্লাস করছেন। প্রায়ই তাঁকে অমন উঁচু ক্লাস থেকে পাকড়াও করে আনতে হত। এম এ. ক্লাসে পড়তে পড়তে তিনি ছাত্র থেকে হয়ে গেলেন অধ্যাপক। তারপর হঠাৎ একদিন বন্দুক কাঁধে করে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপ্লবী নেতা রূপে তিনি আবির্ভূত হলেন।

দেরী হয়ে যাচ্ছে, তাই পরদিন আবার দেখা হবে, এই আশ্বাস দিয়ে বিদায় নিলেন।

* * * *

সকালে উঠেই দেখি মহম্মদ হাজির। বলে চা আর পরোটা প্রস্তুত। মেয়ে হলে ওকে সত্য দ্রৌপদী টাইটেল দিয়ে দিতাম। খেতে বসে তার কাছে শ্রীনগরের একটা বিবরণী নিতে চাইলাম। সে বলল—এ জায়গাটার নাম আমীরা কদল (প্রথম ব্রিজ)। এইটে সহরের প্রাণকেন্দ্র—সদা চঞ্চল। ব্যবসা-পত্তর, হাটবাজার, সব কিছুর কেন্দ্র হল এইটা অর্থাৎ একাধারে ডালহাউসী, ধর্মতলা, বড়বাজার। ঝিলাম নদীটা এঁকে বেঁকে শ্রীনগরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। এখানে মোট ছটা ব্রিজ আছে। বাকি পাঁচটার নামও বলে গেল—হাওয়া কদল (দ্বিতীয় ব্রিজ), ফতে কদল (তৃতীয় ব্রিজ) জেনা কদল (চতুর্থ ব্রিজ), নওয়া কদল (পঞ্চম ব্রিজ), সফা কদল (ষষ্ঠ ব্রিজ); আর একটী আছে, তার নাম ছহ্‌তাবাল লক্ গেট। শেলী বলে—দেখ্ দেখ্—কী চমৎকার।

আরে, তাইত; যেন পরীর দেশের ময়ূরপংখী—ছল্ ছল্, টল্ টল্ করে এগিয়ে চলেছে। চারিদিকে সূক্ষ্ম কাজ করা পর্দা দেওয়া। মধ্যে যেন বরাসন পাতা, গালিচা আর মখমলের তাকিয়া দেওয়া। মহম্মদ বলে, এরই নাম শিকারা। জলপথে এই নৌক চড়ে লোকে বেড়ায়।

শ্রীনগরকে আলগোছে দেখে নেবার জন্মে বেরিয়ে পড়লাম। মহম্মদকে বলে গেলাম, একটা শিকারা ঠিক করতে—খেয়ে দেয়ে বেড়াতে বেরোব।

আমাদের নৌকটা আমীরা কদলের কাছেই। বড় রাস্তা থেকে সামান্ত দূরে। নদীর পারে উঠতেই দেখি, তীর বরাবর সাজান রয়েছে হাউস বোট। সামনেই শ্রীনগরের হেড পোষ্ট-অফিস। ব্রিজের সামনে আসতেই একদল মাঝি ছেঁকে ধরল—"শিকারা সাব"। তাদের হাত এড়িয়ে বড় রাস্তা ধরে চললাম। দু-পাশে বড় বড় বাড়ী, সাজানো দোকান। একটু এগিয়ে দেখি, রাস্তাটা খুব চওড়া—সেণ্ট্রাল এভিনিউ থেকে বড়। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, বাঁধান রাস্তা। আর সেখানে মাথা উঁচু করে আছে বড় বড় হোটেল, সিনেমা। একটু দূরেই প্রকাণ্ড পোলো খেলার মাঠ। রাস্তার এখানে ওখানে বাস দাঁড়িয়ে আছে। বিভিন্ন দিকে যাবার জন্মে তৈরী হচ্ছে যাত্রী নিয়ে।

কিছুদূরেই বাঁ পাশে বিরাট কম্পাউণ্ড দিয়ে ঘেরা নীডোস হোটেল—শ্রীনগরের সর্বশ্রেষ্ঠ পান্থনিবাস। আগে কেবলমাত্র ইয়োরোপীয়ানরা এখানে থাকবার অধিকারী ছিলেন। স্বাধীন ভারতে সে নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন সংবিধানে জ্বল জ্বল করছে—ইকোয়ালিটি বিফোর ল। এ আবার ফাণ্ডামেণ্টাল রাইটের অন্যতম। তবে বলা বাহুল্য, আজও সেখানে যাঁরা ওঠেন, ভারতীয় হলেও তাঁরা প্রো-ইয়োরোপীয়ান—হাবে, ভাবে, চালচলনে, আত্মম্ভরিতার ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের আদর্শ (?) পুরুষদেরও ছাড়িয়ে যান।

একটি বিশেষত্ব নজরে পড়ল; প্রত্যেক স্থানীয় লোকের দোকানে একটী করে সুসজ্জিত আলবোলা সধুম অবস্থায় বিরাজমান। এমন কি রাস্তায় যারা পান

বিড়ি বা ফল নিয়ে বসেছে, তাদের কাছেও বাদ যায় না, তবে তারতম্য আছে আভিজাত্যের সংগে মূল্যমানের।

চারিদিকে সাজান ফলের দোকান, কতক্ষণ আর লোভ সামলান যায়। আঙুর আর আপেল, যে দুটো সব থেকে প্রিয়, কিনে নিয়ে রাস্তার মধ্যেই খেতে খেতে চললাম। আঙুরের সের দশ আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত, আপেল ছ-আনা থেকে বারো আনা। ডোগরা বন্ধুটীকে আমন্ত্রণ করে এলাম শিকারা ভ্রমনে সংগী হবার জন্যে।

*   *   *   *   *

বন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে হাজির। হাতে একটা পোঁটলা। বলা বাহুল্য, এ ভোজনসামগ্রী। ভদ্র সমাজের লোক; অন্তরে যাই থাক ভব্যতার আবরণের একান্ত প্রয়োজন। তাই বললাম—কেন মিছে মিছে হাংগামা করা?

তিনি সবিনয়ে তাঁর কাজের মৃদু সমর্থন করলেন—এ আর কি? আর আমিও ত বাদ যাচ্ছি না।

আমীরা কদলের নিচে দিয়ে শিকারা এগিয়ে চলল। তখন প্রায় ভরা দুপুর। কিছুক্ষণ বাদেই দেখলাম, ঝিলাম নদীর ধার বেয়ে উঠেছে কাশ্মীর সেক্রেটারিয়েট —বিরাট সমৃদ্ধশালী প্রাসাদ। আগে এ ছিল রাজপ্রাসাদ, নাম ছিল— 'শেরগর্‌হি'। দূর থেকে ঝিলাম নদীতে প্রতিবিম্ব সহ প্রাসাদটাকে দেখে কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদের যোগ্য বলে স্বীকার করা যায়। শুনলাম, মহারাজের জন্মদিনে এবং দেওয়ালী উৎসবে আলোক-মালায় সুসজ্জিত করা হয়—সে এক অপূর্ব দৃশ্য। প্রাসাদের এক প্রান্তে রয়েছে গজাধারীর মন্দির।

ধীরে ধীরে এগিয়ে যাই। নদীর দু-পাশে কাঠের বাড়ী, কোথাও ফুলের কোথাও বা ফলের বাগান। ক্রমে ডাল গেটের কাছে গেলাম, দেখি দরজা বন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই গেট খুলে গেল, আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম। এর উদ্দেশ্য ট্যাক্স বা টিকিট আদায় করা নয়, জলের সমতার তারতম্য রক্ষা করা

—ডাল লেকের জলের উচ্চতা ঝিলাম থেকে কয়েক ফিট বেশী। কি করে এটা রক্ষা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি :

দু-পাশে গেট দেওয়া একটা লম্বা নালা রয়েছে। আমাদের শিকারা নালার মধ্যে ঢুকে গেল, কিছুক্ষণ বাদে ঝিলামের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, ডাল হ্রদের দিকের গেটটা সামান্য খুলে গেল। আস্তে আস্তে নালার জল বেড়ে উঠল, তখন আমরা হলাম ডালের অংশ। গেট খুললে গেলাম ডালে। এবার ডালের নৌকা নালার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং ডাল লেকে পড়বে পার্টিশন। তারপর প্রথমে, ঝিলামের মুখটা সামান্য খুলে দেবে, জল যখন নেমে ঝিলামের সমান হয়ে যাবে, তারপর আস্তে আস্তে নৌকগুলো ঝিলামে গিয়ে পড়বে। দিনরাত এই ব্যবস্থা চলেছে। এখানেও ট্র্যাফিক জাম হয়, সে ফাঁড়া কাটিয়ে ওঠা নাকি দুরূহ ব্যাপার। লালবাজারের কণ্ট্রোল রুমের বড় কর্তারা ডেঙার ওপর যা কাটিয়ে উঠতে সময় অসময় হিম্ সিম্ খেয়ে যান, জলপথে জমাটবাঁধা নৌকাপুঞ্জে বিপর্যস্ত হয়ে পড়া, স্থানীয় কর্তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। বললাম—এত হাংগামা করে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করার কী প্রয়োজন? পার্টিশনের নাম শুনলে ভয় হয়।

—প্রয়োজন আছে বলেই কতৃপক্ষ এত হাংগামা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। নদীর জল আসতে দিলেই পলিমাটী জমতে সুরু হবে। হয়ত কিছুদিন বাদে দেখা যাবে, চড়া পড়তে সুরু করেছে।

বদ লোকে বলে, শিশিরের গায়ে নাকি কমিউনিষ্টের গন্ধ আছে; সেই জন্যেই হোক, বা যে জন্যেই হোক, বলে ওঠে—ভালই ত, দেশের জমি বেড়ে যাবে। এখানে ফসল ফলবে চমৎকার, দরিদ্র অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর অভাব কিছুটা পূরণ হবে।

—তাই বলে এত সুন্দর একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে দুমুঠো ফসলের জন্যে টুঁটি টিপে মারতে হবে? তাতেও কি দৈন্য দূর হবে? পেট ভরবে না; লাভের মধ্যে জাত যাবে। ভূস্বর্গকে কানা করা কোন মতেই চলবে না।

—আমাদের শ্রেণীহীন সমাজ সংগঠনের কর্ণধারগণও বলেন, যে দেশের প্রতিটী লোকের অর্থ নৈতিক মানের উন্নতি করতে হবে; তবে দেশের ধনীদের সমস্ত সম্পদ যদি সকল দেশবাসীর মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তা হলেও দেশের কোন উন্নতি হবে না, বরং সবাই হবে ভিখারী। আবার নবীন চীনের দিকে চেয়ে দেখুন, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের অন্ততম—তাদের চির-বিখ্যাত প্রাচীর তারা ভেঙে ফেলছে। তার ইঁট দিয়ে ঘর তুলতে হবে—সবাইকে দিতে হবে মাথা গোঁজবার ঠাঁই। আগে মানুষ, তারপর সৌন্দর্য, খ্যাতি, আভিজাত্য।

তর্ক যে ভাবে এগিয়ে চলেছে, দেখলাম মাটি হয় বোধহয় আজকের ভ্রমনটা, তাই ফাঁক তালে বলে দেই—আসলে আমরা জানিনা, সত্যি কি কারণে ডাল লেক আর ঝিলাম এর মাঝে এমন পার্টিশন। ওটা তুলে দিলেই যে দুদিন বাদে ধানের চারা নধর কান্তি ধরে দেশের শোভা বর্ধন করবে, এমন কোন নিশ্চয়তা অতিবড় আশাবাদীরাও দিতে পারে না। অথচ আমাদের উর্বর মস্তিষ্কের কষ্টকল্পিত এক ধারণা নিয়ে রৈ-রাবণের যুদ্ধ স্থুরু হয়ে গেল। স্থতরাং এখানেই ওর নিষ্পত্তি হোক।

শিশির তখনও ঠাণ্ডা হয় নি। আবার স্থুরু করে, একেই বলে পেটি বুর্জোয়া মেণ্টালিটি, বুঝলি?

এইরে, সর্বনাশ! এর মধ্যেও বুর্জোয়া, তারপর প্রলেটারিয়েট। এই দুই ডিক্টেটরশিপের পাল্লায় পড়ে এই গবীর উলুখাগড়াদের যে প্রাণ যায়।

ডোগরা বন্ধুটী বলে—ডাল লেক নিষ্ফলা নয়, এখানেও প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হয়।

আমি বলি—সেকি? জলের মধ্যে ফল—তাহলে পানিফল?

—কিছুদুর গেলেই দেখতে পাবেন ভাসমান উদ্যান। বড় বড় কাঠ দিয়ে ভেলার মত করে, চারি ধারে কাঠের পাচিল তুলে দেয়, তারপর ভেতরটা মাটি দিয়ে ভরিয়ে দেয়। দেখতে দেখতে দু-দিনে লতাপাতাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

কোন পরিশ্রম নেই, বীজ ছড়াতে যেটুকু মেহনৎ। তবে প্রকৃত মেহনৎ হচ্ছে সেগুলো রক্ষা করা।

—কেন, ভেসে যায় না গলে যায়?

—ভয়ানক চুরি হয়। দেখতে সবই প্রায় এক রকম। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলতে কিছু নেই, একবার চুরি করতে পারলে আর পায় কে? প্রমাণ, মাথা খুঁড়লেও মেলা ভার। অনেক সময় করে কি, সন্ধ্যার মুখে কোন একটা মাঠের পাশ দিয়ে যাবার সময় সকলের অলক্ষ্যে দড়ি দিয়ে বেঁধে আসে মনোমত কোন ভাসমান উদ্যান, দড়ির অপর প্রান্ত রাখে দূরে কোন নির্দিষ্ট স্থানে। তারপর গভীর রাত্রে নৌকয় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে।

আরও মজার ঘটনা শুনুন—একবার কোন সংসারের সকল লোককে নিমন্ত্রণ করে গেছে তার বন্ধু। অনেক দিনের বন্ধু, তার ওপর যে আগ্রহ ও আন্তরিকতা দিয়ে নিমন্ত্রণ করে গেছে, ফেরান সম্ভব নয়…তবে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করছে, তার সুন্দর ভাসমান উদ্যানটার জন্যে। শেষে ভাবে, কি আর হতে পারে, যাবে ত মাত্র এক বেলার জন্যে।

এদিকে বন্ধু যখন সত্যিই সপরিবারে অতিথি হয়ে তার বাড়ী পদার্পণ করল, তখন সে যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়েছ। অতিথি অভ্যাগতদের সমাদর বেশ সাড়ম্বরেই করল। তবে অতিথি সৎকারের প্রতিদানে তাকে রাজদ্বারে অতিথি হতে হয়েছিল—নিমন্ত্রিত বন্ধুর ভাসমান উদ্যান চুরির অপরাধে।

আমি বলি—অদ্ভুত চুরির কথা শুনেছিলাম থাইবার পাশের আফ্রিদিদের। তারা অবশ্য রাইফেল চুরিতে সব থেকে ওস্তাদ। কোন সৈন্যদলের পিছু নিল, সংগের সাথী রাইফেল, আর থলিতে বাঁধা শুকনো রুটী। দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পিছু ধাওয়া করেছে অসতর্ক মুহূর্তের আশায়। আর এমন গা ঢাকা দিয়ে চলে যে কেউ ঘুণাক্ষরেও তাদের গন্ধ পায় না। ওদের বিচার শক্তিও অদ্ভুত। ক্ষণিকের অসাবধানতাও তারা অপচয় করে না। নির্বিবাদে কাজ হাসিল করে চলে আসে। অনেক সময় নাকি এরা গায়ে তেল কালি

বেথে চুরি করতে যায়। প্রথমতঃ, কেউ দেখতে পাবে না। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রাণে না মেরে ধরে ফেলার চেষ্টা করে, পিছলে পালিয়ে আসতে পারে। জীবন যায় যাক, সে ত হাতের পাঁচ, কিন্তু ধরা পড়বে চুরি করতে গিয়ে—অসাফল্য অপমান, হাজতবাস—সে দুঃসহ। অবশ্য আক্রিদিদের জীবনে অসাফল্য কথাটা প্রায় অব্যবহার্য থেকে যায়, বিশেষ করে এই সাধু প্রসংগে। আরও শুনেছিলাম, আক্রিদিরা তাদের এই বিদ্যায় এত পারদর্শী, যে ঘুমন্ত মানুষের বিছানা থেকে এরা অনায়াসে চাদর চুরি করে আনতে পারে, এবং সেটা মালিকের অজ্ঞাতে। সুখ-সুপ্ত পুরুষ সকালে উঠে তাজ্জব বনে দেখবে—বিছানা চাদর শূন্য। গল্পের মত শোনায় এ কথা। অবশ্য গল্পও হতে পারে, তবে তাদের বিশেষ বিদ্যার এই নিপুণতা সত্যি অদ্ভুত।

হঠাৎ কাশ্মীরী বন্ধুটী বলে—ওই যে দূরে ছোট পাহাড়টী দেখছেন, ওটাকে বলে হরি পর্বত। আকবর নাকি তখনকার দিনে এক কোটী টাকা খরচ করে ওখানে একটি দুর্গ তৈরী করেন। সেটি এখন কাশ্মীর রাজ্যের গোলাবারুদের গুদাম। এখানে বর্তমানে এক হিন্দুমন্দির স্থাপিত হয়েছে—শরিকা দেবীর মন্দির।

—শরিকা দেবী?

—কালী মাতার নামান্তর।

তবে এখানে প্রবেশের জন্যে পারমিট লাগে। কেবলমাত্র রামনবমী আর দুর্গা নবমীর দিন সবার অবাধ গতি। এর কাছেই পাগলা গারদ আর সেণ্ট্রাল জেল।

ডালের ওপর দিয়ে চলেছি। জল ঠিক স্বচ্ছ কাচের মত। তীরবর্তী বাড়ীর প্রতিবিম্ব পড়েছে সেখানে। দেখতে চমৎকার। যেন ছবির মত। এখানকার লোকের দারিদ্র্য যেন নিজের সত্ত্বাকে হারিয়ে ফেলেছে, এই সুন্দর পরিবেশের মাঝে।

সামনেই হজরৎবাল, জমকালো মসজিদ। পাথর দিয়ে গড়া। তবে আকৃতিতে মসজিদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। নূর-উদ্-দীন বিজাপুর থেকে হজরৎ মহম্মদের

একটা চুল এনে এই পুণ্য-তীর্থের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই সম্মানে সাজাহান গড়েন এই মসজিদ। ঈদের সময় সুসজ্জিত করা হয়। প্রধান ঘরটী তালা বন্ধ থাকে। আমাদের দেখার জন্যে খুলে দিল। দেখলাম, ভেতরে কেবলমাত্র একটী স্ফীতোদর কুম্ভ আর সামনে ধুপদানি। প্রতি বছর ঈদের সময় মক্কা থেকে জল এনে রাখা হয় এখানে। মুসলমান এবং অতিথি এ অমৃতপানের অধিকারী। মক্কার জল যখন, এত কষ্ট করে আনা, নিশ্চয় অমৃত গোছের হবে—খেয়ে পরখ করলাম এর নতুনত্ব? অমরাবতীতে বসে অমৃত পান করলাম। ভাগ্য ভাল এ দেবলোক নয়, তাহলে অমরত্ব লাভ করে রেশন-প্রিয়-সরকারের অস্বাচ্ছন্দ্য আর ভাবীকালের সন্তানদের অম্লমধুর অভিনন্দনের নিমিত্ত হয়ে থাকতে হত।

*　　*　　*　　*

আবার এগিয়ে চলি। তীরের কাছাকাছি হাউসবোটগুলো বাঁধা। তবে ডাঙা ছুঁয়ে নেই কেউ। তীরে যেতে গেলে শিকারার সাহায্য নিতে হয়। দেখে বেশ বোঝা যায়, ডালের বোটগুলো অভিজাত্যে ঝিলামের বোটগুলো থেকে বড়।

এখানে সাতার কাটবার চলমান বোট পাওয়া যায়। সেগুলোয় ডাইভ দেবার জন্যে স্প্রিং দেওয়া মঞ্চ খাটান থাকে। স্লিপ কেটে জলে পড়বার ব্যবস্থা আছে। আর নৌকর ভেতরে সুসজ্জিত সাজঘর। তবে এসব নৌক এখন একেবারে অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

ডোগরা বন্ধুটী বলে—ওই দেখুন—ওই ছোট্ট বিন্দুমত—ওই হল স্বর্ণলংকা। শিশির বলে—গান্ধীজী প্রতিষ্ঠিত রামরাজ্যে স্বর্ণলংকা—সাম্যবাদীর সাম্রাজ্যে গণতন্ত্র রাষ্ট্র! হয় পূর্ণজ্যোতিতে বিরাজমান অমিত ঐশ্বর্যপুরী মহারাজাধিরাজ রাবণের সমৃদ্ধশালী স্বর্ণলংকা, না হয় স্বর্ণ-বিগত লংকা—পরাধীন, বিভীষণ শাসিত। এর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তির কোন ক্ষেত্র নেই।

আমি বলি—ত্রেতা যুগে ছিল না, তবে বিংশ শতাব্দীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

স্বর্ণলংকায় গিয়ে উঠলাম, ডালের মাঝখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ, চার কোনে চারটে বড় বড় চানার গাছ। দ্বীপের মাঝখানে বিশ্রামের জন্তে কৃত্রিম আচ্ছাদন করা আছে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য ছেড়ে কে ওখানে উঠবে।

আর একটী পরিবার এসেছে দেখতে পেলাম। এক প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে, কিসে যেন ব্যস্ত বলে মনে হল। ভাসা ভাসা মিষ্টি কথা, হাসির টুকরো, ঠুন্ ঠুন্ মিঠে আওয়াজ বেশ লাগছিল। গিয়ে আলাপ করতে পারলে মন্দ হত না। এমন মনোরম পরিবেশ, তরুণী সংগ, একটু মধুর আলাপ, অল্প চপল চটুল হাসি, দুটো হাল্কা অভিযোগ! কিন্তু উপযাচক হয়ে আত্মীয়তা জমাতে যাব? কি মনে করবে? কতটুকু ব্যবধান—কয়েক কদম; স্বপ্নও নয়, তবু দূর, চক্ষুলজ্জার প্রাচীর। বন্ধুদের মধ্যেও দেখি কেউ এ প্রস্তাব তোলে না। তা হলে আমার একারই বাসনা, ওরা কি নির্বিকার? আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়ি ক্যামেরা নিয়ে—কোন কোণ থেকে ছবি নেব, গাছের ডালের কতটা নিলে ভাল হয়, ওদিকে নৌক, পেছনে পাহাড়। একটা ছোট মেয়ে দেখি চুলবুল করছে। ডাকতেই পালিয়ে গেল, আবার তখনি কাছে এসে দাঁড়াল। সে তার মা বাবার সংগে এসেছে চড়ুইভাতি করতে। মেয়েটা একটুতে যেন আপনার জন করে নিল। বাবার কথা, মার কথা, কে বেশী ভালবাসে, কে একদিন সাংঘাতিক মার দিয়েছিল, তাও বলে গেল।

তাকে উপলক্ষ করে যেন অনিচ্ছা সত্বেও সেখানে গেলাম। দেখি এক তরুণী চোখের-জলে-নাকের-জলে হয়ে বাগ-না-মানা কাঁচা কাঠ ধরাতে ব্যস্ত। সুন্দরী, রূপসী—কবি হলে হয়ত 'উছলিত যৌবন প্রভায়' বলে মহাকাব্য সুরু করতাম। সত্যিই ত, রাঙা রাঙা গাল, যেন আপেলের মত রঙীন হয়ে উঠেছে, তাতে ঘামের মুক্তাবিন্দু, দু-একটা কুচো চুল উড়ে এসে পড়েছে চোখে মুখে। যাই হোক তিনি বিবাহিতা, তা-না হলে এই বর্ণনার পেছনে লোকে হয়ত অনেক

কিছু ধারণা করে নিত। সামনেই আমায় দেখে একটু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। আমারও একটু ইতস্ততঃ ভাব। এমন সময় ভদ্রমহোদয় এসে হাজির। একটু আশংকা হল, কি জানি? পরুষ বাক্যে সম্বর্ধনা জানাবেন না ত? মুখখানাও গাম্ভীর্যে ভরা। না অমূলক আশংকা।

তিনি হেসে বলেন—মঞ্জু আপনাকে পেয়ে বসেছে? ওর স্বভাবই ওই। একটু আদর দিলে আর রক্ষে নেই, ঘাড়ে চেপে বসবে।

আমি বলি—এ ত অল্পবিত্তর সব মেয়েরই স্বভাব। ঘাড়ে চাপবার সুযোগ পেলে কোন মেয়েই ছেড়ে কথা বলে না।

আমার ঠোঁটের হাসিকে তিনি সমর্থন জানালেন, সহাস্য মন্তব্যে—ঠিক বলেছেন মশাই, একেবারে ঠিক। ওদিকেতে শ্যাম যেও না যেও না—স্বয়ং বার্ণার্ড শ পর্যন্ত ওই এক কথা বলে গেছেন, আর সাবধান করে গেছেন, ওই ফাঁদে পা, নৈব নৈব চ। শুনুন তাহলে, সে যুগের এক অনুপম লাবণ্যবতী নর্তকী শ মশাইকে জানান—আমাদের বিবাহে আপনি অমত করবেন না। ভেবে দেখুন, আমাদের মিলনে যে সন্তান হবে, সে যখন আপনার অসামান্য প্রতিভা আর আমার মনমোহিনী রূপ লাবণ্য নিয়ে পৃথিবীর বুকে ফুটে উঠবে, তার সৌরভ জগৎকে বিমোহিত করে দেবে—সে হবে অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

শ সায়েব উত্তর দেন—আপনার কথায় বড় আশান্বিত হলাম। তবে ধরুন আমাদের ভাবী সন্তান বুদ্ধিমত্তায় হল আপনার প্রতিবিম্ব ও রূপে আমার মত অপরূপ (জানেন বোধহয়, দেখতে কদাকার বলে অত দাড়ির বহর), তার স্থান কোথায় হবে?

আমি বলি—দুনিয়া শুধু শ সায়েবের নয়। তাছাড়া আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন এই পরাজয়, এই সুখস্বর্গ:

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে
তপস্যার ফল,

তোমারি কটাক্ষ পাতে ত্রিভুবন
যৌবন চঞ্চল।

তিনি যেন উত্তেজিত হয়ে বলেন—তোমরা যুবক, তোমরা সে পরাজয় মাথা পেতে নেবে? তারা তোমাদের নাকের ওপর তাদের জয়ডংকা বাজিয়ে যাবে? মেয়েরা করবে ছেলেদের ওপর আধিপত্য।

ফোঁস্ করে উঠলেন শ্রীমতী—বেশ করবে, কেন করবে না? যুগে যুগে শ্রীকৃষ্ণরাই রাধিকার মান ভঞ্জন করেছে। তোমরাই ত বলেছ—দেহি পদপল্লব-মুদারম্।

মুচকি হেসে বলেন—তা করেও ত শ্রীমুখ ঝংকার থেকে অব্যাহতি নেই।

আমি বলি—দেখুন, একে আগুনে তেতে আছেন, তার আপনি অগ্নিবাণ ছাড়ছেন—অগ্নিশর্মা হওয়া বিশেষ অসম্ভব নয়। আপনি ত পতি-দেবতা, ওঁর কাছে সর্ব-দেব-পারংগম। আমি ব্যাচারা ক্ষণিকের জন্যে এসে তিক্ত থেকে যাব।

তিনি বলেন—আচ্ছা মঞ্জু এস। তুমি যখন সব উৎপাতের সূত্রপাত করেছ, তুমিই মিটিয়ে দাও। বল, ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি!

কি মনে করে মঞ্জু হেসে উঠল। আমরাও সবাই হেসে উঠলাম।

বন্ধুরা হাসির শব্দে বোধহয় চমকে উঠেছিল। হয়ত থ বনে গিয়েছিল। ভেবেছিল, আমার পূর্ব পরিচিত নাকি? মনে মনে যে একটু ঈর্ষা হয়নি তা নয়। শেষে সবাই গুটি গুটি করে আমার দিকে এল। সবার সংগে আলাপ পরিচয় হল। ভদ্রলোকের বাড়ী যুক্তপ্রদেশে, দিল্লীতে চাকরী করেন। কয়েক দিন হল এসেছেন, এখনও কিছুদিন থাকবেন। শ্রীনগরের কোন এক হোটেলে উঠেছেন। আজ চড়ুইভাতি করার জন্যে এখানে আগমন।

তাঁদের রান্না এখনও শেষ হয়নি। যাইহোক সকলের খাবার পারমুটেশন কম্বিনেশন করে সদব্যবহার করা গেল। তাঁদের সংগ ছাড়তে সত্যি প্রাণে

লাগছিল, কিন্তু না ছেড়ে ত উপায় নেই। আজকের মধ্যে অনেক কিছু দেখা শেষ করতে হবে।

নৌক ছেড়ে দিল। শিশির বলে—স্বর্ণলংকা নামটা গালভরা, আসলে কিছুই নয়।

—তা হোক, এর স্মৃতিটা কিন্তু আমাদের কাছে স্বর্ণময়।

—কিছু দূরে আরও একটা দ্বীপ আছে, রূপলংকা।

—তা থাক, স্বর্ণস্মৃতিকে এখুনি আমরা হারাতে চাইনা। বরং নদী পথে তা রোমন্থন করা থাক।

* * * * *

ডাল লেক ছেড়ে শিকারা সরু নালার পথে প্রবেশ করে। জলপথে শালিমার-বাগের দোর গোড়ায় পৌছবার জন্যে এই ব্যবস্থা। সামনে সাজান বাগান। সিঁড়ি দিয়ে আবার ওপরের দিকে উঠে গেছে। তর্ তর্ করে উঠে গেলাম। এযে আবার বাগান।

শেলী বলে—আরও আছে নাকি?

—সিঁড়ি যখন দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয় আছে। চারতালা বাগান। যখন যেটাতে যাই, দেখে মনেহয়, এটা ছাড়া আর দ্বিতীয় বাগান নেই। প্রত্যেকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ উদ্যান। চারিদিক বিভিন্ন ফুলগাছে ভরা। ঝাউগাছগুলি কেমন সুন্দর করে ছেঁটে দেওয়া। বাগানটি সযত্ন রক্ষিত। বাগানের মাঝখান দিয়ে নালা কাটা আছে। আর ঢালু জায়গায় খাঁজকাটা পাথর বসান, যাতে জলপ্রবাহ ছিটকে পড়ে চতুর্দিকে। মাঝে মাঝে জল প্রবাহের ওপর বিশ্রাম-কুটীর। একেবারে ওপর তলায় অনেকগুলো ফোয়ারা আছে। মাঝের তলায় একটা কালো রঙের বড় মার্বেল পাথরের বিশ্রাম কেন্দ্র, এর নাম প্রেম-নিকুঞ্জ। বাদশাহের রূপসী প্রেয়সীরা, চপলা চটুলা তন্বী-শ্যামারা এখানে এসে রংগ-রসে, আনন্দ-উল্লাসে সৃষ্টি করত মোহিনীময় পরিবেশ। নিম্নে সতত-সঞ্চরমান জলস্রোত, চতুর্দিকে প্রস্ফুটিত ফোয়ারা। গাছে গাছে গাইত কত নাম-না-জানা পাখী।

এ কল্পনার দৃশ্যপট। কারণ সে চপলা-চটুলাও নেই, সে পরিবেশও নেই। কিছু দিন আগেও অন্তত প্রতি রবিবার জলস্রোত প্রবাহিত হত, ফোয়ারাগুলো সজীব হয়ে উঠত। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধপ্রপীড়িত কাশ্মীরে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শেলী বলে—কিরে শিশির, তুই ত কমিউনিষ্ট। বললি না যে বড়, কয়েক-জনের সুখের জন্যে কী ভীষণ অত্যাচার হয়ে গেছে এক জনসমাজের ওপর। নূরজাহান, কোথাকার একটা সামান্য নারী, তার বিলাস-ব্যসনের জন্যে কত কৃতদাস দিনের পর দিন তাদের শক্তি, তাদের জীবন, তাদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে রাজশক্তির পাদমূলে!

আমি বলি—থাক, কেন আর ওকে জ্বালাচ্ছিস্।

আবার চলেছি। এবার নিশাদবাগ। সামনে বিস্তৃত ডাল লেক, পেছনে বিরাট পাহাড়। বাগান উঠে গেছে ধাপের পর ধাপ—সংখ্যায় কতগুলো গুনতে গিয়ে গুলিয়ে গেল। সাজান বাগান, রঙ্-বেরঙের ফুলে ভরা, চারিদিকে ঝর্ণা, তবে এখন শুকিয়ে আছে যত্নের অভাবে।

দু-পাশে বিস্তৃত ফলের বাগান। কত আপেল ফলে রয়েছে, গাছ যেন নুয়ে পড়েছে ফলের ভারে। বাংলাদেশে যেমন এক একটা গাছে অসংখ্য জামরুল বা কালোজাম ফলে তেমনি; তবে গাছগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট।

হাতের কাছে এমন লাল টুকটুকে আপেল ফলে রয়েছে, চলতে গেলে গায়ে হাতে ঠেকে যাচ্ছে অথচ একটাও খেতে পারব না! শেলী ফাঁক বুঝে টুক করে পেড়ে নেয় একটা। কি জানি, বোধহয় শকুনীর দৃষ্টি নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। ঠিক ধরেছে; বলে—এ বাবু, এ বাবু—চলিয়ে সর্দারজীকো পাস্।

আচ্ছা তাই যাওয়া যাক। গিয়ে দেখি অবাক কাণ্ড। আমাদের দেশে যেমন ধান রোদে দেয়, তেমনি ভাবে বিছিয়ে রেখেছে আপেল। লোক বসে গেছে সর্ট করতে—কোনটা বঢ়িয়া, কোনটা আউর বঢ়িয়া, কোনটা সব্‌সে বঢ়িয়া। আর সর্দার-সাহেব সপারিষদ খাটিয়ায় বসে গড়গড়া টানছিলেন।

বললাম—আমরা দাম দিয়ে কিনতে চাই, তোমাদের তাতে আপত্তি কেন? বিক্রি তোমাদের করতেই হবে, তবে আমাদের কাছে করবে না কেন?

বলে—আমাদের বিক্রি করার কোন ক্ষমতা নেই। ষ্টেটের বাগান; বিক্রি করলে আমাদের চাকরী যাবে।

কি আর করি? এত সাধের আপেলটাও তাদের হাতে তুলে দিয়ে চলে আসতে হল।

পড়ন্ত রোদে আমাদের শিকারা এগিয়ে চলে—ছলাৎ ছলাৎ করে। বাপ, বেটা, নাতি তিনপুরুষ মিলে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। গড়গড়াটি কিন্তু সদাই প্রস্তুত, অগ্নিবিহীন থাকবার অবসর নেই। হস্তান্তরিত হয়ে চলেছে বাবা থেকে ছেলে, ছেলে থেকে নাতি। এতে সংকোচের কিছু নেই, অসম্মানেরও কোন বালাই নেই—এতেই তারা অভ্যস্ত।

শিকারা সম্বন্ধে একটা ধারণা দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো অনেকটা আমাদের দেশের ছিপের মত। কিন্তু তার মাথার ওপর ছাউনী দেওয়া, তবে খড় বা চাঁচ দিয়ে জবড়জং করা নয়, কাঠ দিয়ে রুচিসম্মতভাবে গড়া। নৌকগুলো চ্যাপ্টা ধরণের, ধারগুলো জল থেকে সামান্ত উঁচুতে থাকে। এখানকার নদী-নালা খুব শান্ত, তাই এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। বাংলা দেশের তরংগ-বিক্ষুব্ধ নদীতে এই শিকারা চড়লে, 'হরি হে দীনবন্ধু' স্মরণ করেও 'পার কর' বললে, পারের একটু বেশী, পরপারে নিয়ে ফেলবে। কাশ্মীরের নদী-নালা শীতকালে বরফে ঢেকে যায়। তখন এই নৌকগুলো স্লেজগাড়ীর মত ব্যবহার করা হয়। কিন্তু যদি আমাদের দেশের নৌকর মত শিকারার তলাটা দু-পাশে সরু হয়ে নেমে যেত, তাহলে বরফের ওপর দিয়ে চালান সম্ভব হত না।

মাঝির কাছে শুনলাম, এখানে আর এক রকম নৌক আছে, তাকে বলে ডোঙা। হাউসবোট থেকে ছোট, আবার শিকারা থেকে বড়। এগুলো সতত সঞ্চরমান বাসা। স্থানীয় কিছু লোক এই বাসা পছন্দ করে। এই নৌকর মধ্যেই তাদের ঘরসংসার। কোন নির্দিষ্ট ঠিকানা তাদের নেই। পাঁচদিন

এখানে থাকল, আবার একঘেঁয়ে লাগলে নোঙর করল অন্য প্রান্তে। তারা যে বাধ্য হয়ে, কাবলীওয়ালার ভয়ে বা সংগতির অভাবে এমন জীবন কাটায় তা নয়, নিছক সখ। তাদের মধ্যে অনেকে বেশ অবস্থাপন্ন। হয়ত, সহরের তিন চার খানা বাড়ীর মালিক। কেউবা বেশ শিক্ষিত, সহরে কোন অফিসে চাকরী করে। পর্যটক জীবনে এ ব্যবস্থাটা লোভনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু যাযাবরের ছাচে ঢালা এই অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা—সমাজবন্ধনহীন, সৃষ্টিছাড়া—সভ্যতার নিদর্শন নয়।

চশমাসাহী ডাললেকের তীর থেকে প্রায় আধমাইল হবে। বাগানটা ছোট কিন্তু সব থেকে সুসজ্জিত। ছোট বলেই এর তত্বাবধান সহজ হয়েছে। বাইরে উচ্চ প্রাচীর, লতান গাছে ঢাকা; যেন মনে হয় কুঞ্জবন। এখানে ফুলের গাছ ছাড়াও সারি সারি ফুলগাছের টব বসান। এও দোতলা বাগান। এর ফোয়ারাগুলো এখনও সজীব। সব থেকে সুন্দর হল এর উপরতলার পাহাড়ী ঝর্ণাটী। জলটাকে আটকান আছে একটা কুণ্ডে, সেখান থেকে আবার নেমে গেছে পরের ধাপে। শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধান কুণ্ডটী। লোকের বেশী আকর্ষণের অন্যতম কারণ হল এই ঝর্ণার জল। এ শুধু সুস্বাদু নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে।

* * * * *

ফিরে এসে দেখি মহম্মদ খাবার তৈরী করে আমাদের অপেক্ষা করছে। একটু বিশ্রাম করেই খেতে বসলাম। খাবার সময় দেখি সব গরম, ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমাদের বিশ্রামের অবসরে সে সব গরম করে এনেছে।

মানুষকে কি করে আরাম দিতে হয়, কি করে তাদের খুশী করা যায়, তার জন্যে এরা ব্যস্ত। এরা এত ভদ্র, এত বিনয়ী, যে তার তুলনা হয় না। ভদ্র-অভদ্র অনেকরকম ব্যবহার ওদের ওপর করেছি, কিন্তু কাউকে কোন দিন উদ্ধত হয়ে কথা বলতে দেখিনি।

শিশির বলেছিল, অত্যাচার আর নিপীড়নে কথা বলবার সাহসটুকু পর্যন্ত

ওরা হারিয়েছে। ওরা জানে, পর্যটকরা রাজার জাত ; আর এরা তাদের দাস, সেবা করাই এদের ধর্ম—তাদের সন্তুষ্টি বিধানই এদের জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু তা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ এরাই ত প্রগতিহীন শাসনের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, গুলির সামনে বুক পেতে দিয়েছে, এদের হুংকারে রাজশক্তি কেঁপে উঠেছে। অত্যাচার মানুষকে পশু করতে পারে কিন্তু এমন ভদ্র ও বিনয়ী করতে পারে না। পর্যটক-জীবনে এত সেবা, এত সহযোগিতা ভারতের আর কোথাও পাইনি। যতক্ষণ খাওয়া শেষ না হয়েছে, দাঁড়িয়ে থেকেছে আমাদের কাছে।

মহম্মদ বলে—কাল আমার সংগে চলুন না ডিরেক্টর অফ ভিসিটর্স্‌স ব্যুরোয়। যতদিন থাকবেন ততদিনের জন্যে রেশন কার্ড করিয়ে আনি। তা-হলে চাল প্রতি মণ ৩৪৲, আটা ৩০৲ টাকায় পাবেন। তা না হলে, চাল ৬০৲ আর আটা ৫০৲ দরে কিনতে হবে। অবশ্য আমরা ডেরাডুনের চাল খেতাম, তার দাম ৮০৲ মণ।

আমি বললাম—তোমাদেরও কি এই প্রাণান্তকর দাম দিয়ে চাল কিনে খেতে হয় ? তাহলে তোমরা খেয়ে বেঁচে আছ, না, না খেয়ে বেঁচে আছ ?

—আমাদের দেশের জনসাধারণ অনাহার আর অর্ধাহারের ওপর বেঁচে আছে সত্যি, তবে আমাদের অত দাম লাগে না। স্থানীয় লোকের রেশন কার্ডে ১৩৲ মর্ণ দরে চাল ও আটা পাওয়া যায়।

—রেশন ত শ্রীনগরটুকু, তার বাইরে কত দামে বিক্রি হয় ?

—না, এত বেশী দর নয়। তাই ত দু-সের চাল আনতে পারলেই দু-টাকা লাভ। দেখেননি, সহরের ঠিক সীমানায় কাষ্টমস অফিস ওৎ পেতে বসে আছে, যাত্রীদের গাঁট পর্যন্ত সার্চ করে। দেখে দু-মুঠো চাল আনলো কিনা সংগে করে। আর বাসের ত রক্ষা নেই, কম করে আধঘণ্টা ধরে দেখবে। অনেকে ধরাও পড়েছে ; কেউ কেউ বাসের তলায় থাক তৈরী করে লুকিয়ে চাল আনে, কেউ বা ইঞ্জিনের কোন ফাঁকে লুকোতে চেষ্টা করেছে ছোট্ট এক থলি চাল।

আলোচনা বড় নীরস হয়ে যাচ্ছে, তাই কথা ঘোরাবার জন্যে বলি—আচ্ছা মহম্মদ, ওই যে দেখে এলাম বড় বড় দোতলা নৌকর মত ওগুলোও কি হাউসবোট ?

মহম্মদ বলে—হ্যাঁ তাই। ও অনেকটা হোটেলের মত ; একা কেউ ত এত বড় বাড়ী ভাড়া নিতে পারবে না। ওখানে লাইব্রেরী, ক্লাবঘর, এমন কি বিলিয়ার্ড ও টেবল-টেনিস খেলার ব্যবস্থা আছে, ড্যানসিং হল পর্যন্ত পাবেন।

আরও শুনলাম, দু-বছর আগে আজকের দিনের মত দুরবস্থা এরা কল্পনাও করতে পারেনি। এমন সময় বেড়াতে এলে দেখা যেত রাজসূয় ব্যাপার। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত একটা উল্লাসে ভরা—কী চঞ্চলতা, কী আনন্দ ! হাস্যে, লাস্যে, আস্যে ভরা কী পরিবেশ ! আর আজ টিম্ টিম্ করছে সব। বছরে কারও বরাতে দিন কয়েকের জন্যে কোন যাত্রী জুটলে, সে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করে। আগের তহবিল ভাঙিয়ে তারা চালাচ্ছে। অনেকে হাউসবোট বেচে দিতে সুরু করেছে। এমনি ভাবে আর কয়েক বছর চললে, সব ফুঁকে দিয়ে হয়ত বুড়ো বয়সে লাঙল কাঁধে করার মহড়া দিতে হবে।

আমাদের জীবনটাই একটা অখণ্ড করুণ নাটক, এমন বিক্ষিপ্ত করুণ কাহিনী শুনে মনের বোঝা বাড়িয়ে কি লাভ ?

শেষে বলি—দেখ, তোমার ত চাল চুরি করে আনার প্রয়োজন হবে না, অনাহারে মরবার ভয় নেই বা লাঙল কাঁধে গরু ঠেঙাতে হবে, এমন আশংকাও নেই ; তবে কেন ওসব বকছ ?

—তা হুজুর, আপনাদের পাঁচজনের অনুগ্রহে ......।

—তবে ওসব থাক। তোমার ঘরকন্নার কথা বল। বউ আছে ত ?

একটু হেসে, ঘাড় কাত করে উত্তর দেয়। বলে—আর আছে ছোট এক ভাই, সে লক্কা পায়রার মত ঘুরে বেড়ায়। আমার আরও চারটে হাউসবোট আছে, দেখাশুনো করার জন্যে লোক রেখে দিতে হয়েছে। ইচ্ছে করলে ও অনায়াসে একটা দেখতে পারে। কিন্তু কে কার কথা শোনে !

—এমন ভাই থাকতে, সে এত কষ্ট স্বীকার করবে কেন?···আচ্ছা ওই যে একহাত গয়নাপরা, কচি কচি মুখ, কেবল উঁকি ঝুঁকি মারে, ওই বুঝি তোমার···খাসা বউ ত তোমার—দেখতে বেশ সুন্দর।

সলজ্জ হাসিভরা মুখে মেনে নেয় আমাদের কথা। দেখলাম বেশ গর্ব বোধ করছে। সুন্দর স্ত্রী, গর্বেরই বিষয়।

—তোমার বউয়ের নামটি কি? নিশ্চয় আরও সুন্দর?

এবার উত্তর দেয় না, লজ্জায় মুখ নিচু করে। সরস খোঁচা দিয়ে নামটা বের করবার জন্যে বললাম—তোমাদের বউয়ের নাম ধরতে নেই বুঝি?

—না হুজুর। আমরা বউকে ডাকতে হলে ছেলের নাম ধরে ডাকি, আর ছেলে না থাকলে নিজের নাম ভরসা।

শিশির বলে—ওরা স্ত্রী-স্বাধীনতার গোড়ায় কোপ দিয়েছে। পুরুষের ভেতর দিয়ে নারীর অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিলোপ করে দিতে চায়।

—সাধে কি আর তোকে কমিউনিষ্ট বলি, ছুতো বের করাই দেখছি তোর স্বভাব। দেখবিও না তা যুক্তি-সংগত কি না? অতি আধুনিক 'ডেবট রে'র সংগে 'কিটি মিটার'এর বিয়ে হলে 'মিটা' ডিলিট করে 'এ-কার' বসাতে নিশ্চয় অতি প্রগতিশীলাও মৃদু আপত্তি জানান না। বিলাতের স্বরাজলব্ধ স্ত্রী-সমাজও নিজেদের নাম ভুলে যেতে গর্ব বোধ করে। তবে আমি ভাবছিলাম, ওর মধ্যে না আছে কোন মাধুর্য, না আছে কোন থ্রিল। তার চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয় আমাদের 'ওগো' বা 'শুনছো'—কেমন একটা শিহরণ আছে ওর মধ্যে, মনে হয় ওই ছোট্ট কথাটীর মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে স্পর্শসুখ।

শেলী বলে—কিরে? তুই যেন চোখবুঁজে স্পর্শসুখ অনুভব করছিস্ বলে মনে হচ্ছে!

*　　　*　　　*　　　*

কি মনে করছে সব। কবে বাড়ী ছেড়ে এসেছি, একখানা চিরকুটও এখন

লেখা হয়নি। সবাই হয়ত ভাবছে? 'তিনি' নিশ্চয়ই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিবর্তিত হয়েছেন। অভিমানে নাক ফুলিয়ে করেছেন ঢোড়া সাপ, মুখখানি হাঁড়িতে রূপায়িত হয়েছে—কান্না-কাটির হাট বসিয়ে ফেলেছেন কিনা তাই বা কে জানে? ফুর্তিতে এত মস্‌গুল হয়ে ছিলাম, যে বাড়ীঘরের কথা প্রায় মন থেকে মুছেই গিয়েছিল, এমন কি 'তাঁর' কালো হরিণ-চোখ দুটও। ট্রিপার্টিয়েট কন্‌ফারেন্স বসল চায়ের আসরে, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল—সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে, মস্ত ভুল হয়ে গেছে, কী হবে?

বলি—কী আর হবে? কচি খোকাটী ত কেউ নও, যে ছেলেধরার হাতে পড়েছ ভেবে কাঁদতে বসবে। অন্যায় করেছ, একটু গোবরগোলা জল খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেই সব গোল মিটে যাবে। অর্থাৎ চিঠির অবতারণা হবে যেন মূর্তিমান বিনয়, মাঝে ভীষণ ঝড়-ঝন্‌ঝা, বিপদ-আপদ, তবে এখন খুব আরামে আছি, তাহলেই সব গোল মিটে যাবে। ভাবনা চুকে যাবে, সহানু-ভূতি আসবে, রাগও পড়বে।

আমাদের বাক্স-প্যাটরা থেকে বেরোল এক গাদা খাম, পোষ্ট-কার্ড যা কলকাতা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। ভেবেছিলাম, ডাকঘরবিহীন দেশে গিয়ে পড়লেও খাম পোষ্ট-কার্ডের অভাবে যেন বাড়ীর সম্পর্ক একদিনও বিচ্ছিন্ন না হয়। কাজ যাই হোক, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই কোথাও। মিছে মিছে কথা তুলেও লাভ নেই, আমাদের হাউসবোটের প্রায় মুখোমুখি শ্রীনগরের প্রধান ডাকঘর।

বলি—তা ভাল, আজকের দিনটা 'লিবী ভেজন ডে' পালন করা যাক।

—সে আবার কি?

—কেন? প্রথম শব্দটা স্বাধীন ভারতে জন্মেছে, লিপিকার বাংলা পরিভাষা রূপে। দ্বিতীয় শব্দ হল রাষ্ট্রভাষা প্রচারণী কল্পে, আর তৃতীয়টী সন্তুষ্ট করবে কমনওয়েলথেশ্বরকে।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি যাদের চিঠি লেখার কথা ভাবিওনি

কোনদিন, তাদেরও একটা করে লিখলাম। তখন শিশিরকে রাগাবার জন্তে বললাম—তুই বরং বাড়ীর ঠাকুর, চাকর আর অফিসের পিওনকে লিখে দে—খবর পৌছবে, সাম্যবাদও হবে।

—না, কুলি-মজুরের দলে আমি নই। ট্রট্স্কিকে আমি কোন দিনই পছন্দ করি না। বরং ভাবছি কোন চাষীকে লিখব।

—কে সেই ভাগ্যবান পুরুষপ্রবর?

—কেন, সে হলধরের ছবি দেখিস্‌নি! কাগজে কাগজে হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল—কোলকাতার কোন প্রাসাদ-অংগনে প্রচুর ফসলের সম্ভাব্যতায় জাতীয় প্রচারকার্যে এসেছিল নব জাগরণ!

—কী বকছিস্?

—মনে নেই। তোদের 'মেমারি' এত 'ফিক্‌ল'। স্লিপার পায়ে, গায়ে পান্‌জাবি, পরণে লম্বা ধুতি, চোখে কাল পাথর লাগান চশমা, লাঙলধরে দাঁড়িয়ে শ্রীগোপাল চক্রবর্তী।

—তাহলে শিশিরেরও রসজ্ঞান আছে।

লিপিকা লেখনের প্রথম পর্ব শেষ করে গেলাম ডিরেক্টর অফ ভিসিটার্স ব্যুরো, যাদের বিজ্ঞাপন প্রথম আকৃষ্ট করেছিল কাশ্মীর আসার জন্তে। উদ্দেশ্য রেশন কার্ড বাগান নয়, ফিরবার রাস্তা সুগম করা। অফিসটী দেখি প্রায় টিম্ টিম্ করছে; সবাই খাতাপত্র তুলে রেখে গা এলিয়ে হাই তুলছে। এখন তাদের ধুনো-গংগাজল দেওয়াই সার, কেউ সেখানে ছোটে না সাহায্যের আশায়। আমাদের পেয়ে প্রায় বর্তে গিয়েছিল, কিন্তু সব উৎসাহ যেন দমকা হাওয়ায় নিবে গেল, যখন শুনল, আমরা ফেরবার পারমিটের জন্তে এসেছি। বললে, ওতে আমাদের কোন হাত নেই। ডি. আই. জি. (পুলিস) এর কাছে যেতে হবে। দুপক্ষেরই ব্যর্থ-মনোরথ।

আগে অবশ্য এখানে কিউ দেবার মত অবস্থা হত। বিশেষতঃ আগষ্টের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তখন হাউসবোটের মালিকরা

আজকের দিনের মত একজন যাত্রীর আশায় তীর্থের কাক হয়ে বসে থাকত না, বরং লোকেরাই হন্যে হয়ে বেড়াত আশ্রয়ের সন্ধানে। ভিসিটার্স ব্যুরোয় গিয়ে এর জন্যে ওয়েটিং লিষ্টে নাম লিখিয়ে আসত। হোটেল, বাংলো প্রভৃতির খুঁটিনাটি বিবরণ এখানে থাকত। এরাই যাত্রীদের সুবিধামত আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। ঠকাবার উপায়ও ছিল না। সব রেট বাঁধা। নবাগতকে হোটেল-চার্জ থেকে কুলিভাড়া পর্যন্ত এরা জানিয়ে দিতেন। সব ব্যবসাদারদের রেজিষ্ট্রেশন-রূপী চাকতি নেবার জন্যে দরবার করতে হত এখানে। যাত্রীদের সংগে অসদ্ব্যবহার করলে চাকতি হারাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকত। অবশ্য ছোটখাট কিছু ঘটে গেলে, তাঁরা মধ্যস্থতা করে মিটিয়ে দিতেন। কোন্ কোন্ দোকানদার কালো তালিকায় বিরাজ করেন, তারও একটা ফিরিস্তি দিয়ে দিতেন। মোট কথা, যাত্রীদের তাঁরা একাধারে পরিচালক, সেবক থেকে আরম্ভ করে কাশ্মীরের ব্র্যাডশ পর্যন্ত। অবশ্য বর্তমানে তার কোন মাহাত্ম্য নেই, কারণ খদ্দেরপত্তর না থাকায় খোদ মালিকের দল, বাঁধা দর থেকে কমেই যাত্রীদের সাধাসাধি করছে।

জি ই·· ····নিউ দিল্লী, খুঁজে বের করতে হবে। কয়েকজন বাঙালী কাজ করেন। উদ্দেশ্য তাঁদের সংগে দেখা করা ও সাহায্য লাভ। অবশ্য নিউদিল্লীতে গিয়ে নয়, শ্রীনগরেই। অপারেশন এরিয়া মাত্রই এমনিধারা ঠিকানা দেওয়া থাকে; যাতে ঠিকানার ওপর নির্ভর করে কোন গুপ্তচর সৈন্যবাহিনী সম্পর্কিত কোন খবরাখবর নির্ধারণ করতে না পারে। সেখানকার একজন বন্ধুর কাছে পরে শুনেছিলাম—কাশ্মীরে আছি শুনলে, যুদ্ধক্ষেত্র ভেবে বাড়ীতে হয়ত কান্নাকাটি করবে, তাই এই রহস্যটুকু জানাইনি; ওরা জানে আমি দিল্লীতেই আছি। খুঁজে বের করতে বেশী বেগ পেতে হল না। তাঁরা ত দেখে অবাক! বলেন—গেটপাশ নেই, কিছু নেই, ঢুকলেন কি করে? এ যে প্রটেক্টেড এরিয়া।

—শ্রীনগর পর্যন্ত আসতে পারলাম, আর এইটুকু আসতে আটকে পড়ব?

তাজ্জব কথা বলছেন যে? কেবল পথে একটু ভুগতে হয়েছে ত্র্যহস্পর্শের সংযোগে। তা পথের বাঙালী দাদারাই শান্তি-শস্তেন করে আমাদের উদ্ধার করেছেন।

অফিসে বাঙালীদের মধ্যে যেন হৈ-হুল্লোড় পড়ে গেল। কলকাতা থেকে দেশের লোক এসেছে। শুনবে তাদের ঘরের খবর, পাড়ার মজ্‌লিশ, ক্লাবের সন্দেশ। আমরা যেন তাদের নিকট আত্মীয়।

বললাম খুলে—দেখুন, টাকা কড়ি নেই আমাদের। তবে সখ আছে আঠের আনা, আপনাদের আশ্রয়ে যদি মাথা গলাবার অসুবিধে না থাকে, তা হলে মন্দ হয়না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। আরে এখুনি আসুন না মালপত্তর নিয়ে। আমাদের মেসে সব এম. ই. এস-এর বাঙালী, হৈ-হল্লা করে কাটিয়ে দেব দিনগুলো।

—অত আপ্যায়নের প্রয়োজন হবে না। ঘাড়ে চাপবার সুযোগ পেলে আর ছাড়ন ছোড়ন নেই। গল্প-গুজব সেরে চা পানান্তে তাঁদের কাছে তখনকার মত বিদায় নিলাম।

* * * * *

আমীরা কদল পার হয়ে কিছু দূর গিয়ে দক্ষিণে ডি আই. জি. (পুলিশ) এর অফিস। পারমিট দেবার জন্যে একটা কেতাদুরস্ত অফিস বসে গেছে। যাঁরা কাশ্মীর যাবার সময়, যাতায়াত ভ্রমণের পারমিট করিয়ে নেন, তাঁদেরও একবার পদধূলি দিতে হয়; তবে তা অনুমোদিত হতে বেশী দেরী লাগে না। আমাদের ভিন্ন ব্যাপার। প্রথমে ত হটিয়েই দেয়। অত সহজে হটবার বান্দা আমরা নই; চেলা-চামুণ্ড পেরিয়ে গট্‌ মট্‌ করে ঢুকে গেলাম খোদ কর্তার ঘরে। নথি স্বরূপ কাশ্মীর প্রবেশের অনুমতি পত্রের নকল রেখে দিয়েছিলাম; সেটা দেখাবার পর, তিন জনকে তিনখানা ফর্ম ফিল আপ করে দিতে বললেন।

ফর্মে সেই মামুলী গদ—নাম, ধাম, ঠিকানা, কোষ্টী; কোথায় যাবে? কি জন্যে যাবে? কতদিনের জন্যে যাবে? ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, 'প্লেয়ার্স প্লিস্' করিয়ে, বকশিশ দিয়ে যখন কাজ হাসিল করে পথে বেরোলাম তখন বেলা পড়ে গেছে।

ফিরে এসে শুনলাম, কে একজন, বাঙালী বাবু আছে শুনে অনেকবার খুঁজে গেছে। বাঙালী নিশ্চয়। যাক সংগীর সংখ্যা বাড়ল, মন্দ হবে না। নাঃ, বেরিয়ে দরকার নেই, যদি এসে আবার ফিরে যায়। বরং লিপিকা লেখনের দ্বিতীয় পর্ব সুরু করা যাক। আর হয়ত লেখার সময় পাওয়া যাবে না।

হায়! এর যে সেণ্টেনারী উৎসব পালন করার সময় হয়েছে। আমাদের কাছে ঘাটে বয়ে নিয়ে যাবার দায় ছাড়া আর কিছু নয়। বুড়ো দাদুর সংগে তরুণী নাতনীও ত আসতে পারে? সাদর সম্ভাষণ জানালাম—চা আনতে হুকুম দিলাম। বিলম্বে হতাশ হতে হল, তিনি স্বপ্রধান হয়ে এসেছেন, বাহন কেউ আসেনি। কাছেই এক হাউসবোটে উঠেছেন, দৈনিক মাশুল সাতটাকা, ওটা নাকি মোটেই ভাল নয়। আমাদের এখানেই তিনি থাকতে চান, তাতে যত টাকা লাগে লাগুক, কুছ্ পরোয়া নেই। অবশ্য আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে নয়, আমাদের সংগী করে নিয়ে। ঘাড়ে চাপল বুড়ো। কি করি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে সসম্ভ্রমে বলতে হল—আপত্তির আর কি? ভালই ত! বিদেশে বিভুঁয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি না থাকলে চলবে কেন?

তিনি কলকাতার একজন বড় ব্যবসায়ী, অবস্থাপন্ন লোক। গরীব অভাগা নাতিদের যদি কিছু খাইয়ে দাইয়ে প্রত্যুপকার করেন, মন্দ কি? পুষিয়ে যাবে।

তাঁর প্রসংগ এইখানেই শেষ করি। কারণ সেটা খুব মধুর নয়। তিন দিন ধরে আমাদের পক্ষপুটে ঘুরে বেড়াবার পর ফিরে যাবার সময় বললেন—আমি বড় ষ্ট্রিক্ট প্রিন্সিপ্লের লোক। আমার সংগে ত কথা হয়নি অন্যান্য চার্জ

দিতে হবে। আমি খালি এই ক-দিনের মিলবাবদ মোটমাট যা খরচ হয়েছে, তার সিকিভাগ দেব। মাত্র সিকি, ষোল আনা ত দূরের কথা, স-পাঁচ আনা দক্ষিণা দিতেও নারাজ। দাদুর মর্যাদা পেয়ে, অসময়ের নাতিদের এমন ভাবে প্রতিদান দেবেন বুঝতে পারিনি। কবে এম ই. এস.-এর বন্ধুদের আশ্রয়ে গিয়ে উঠতাম। জোর করে আটকে রেখে শেষে নিজেরটা দিতে নারাজ।

বললাম—না মশাই, এক পয়সাও চাই না। ওটুকু অনুগ্রহ না দেখালেও চলবে। জানবো চোর, বাটপারের হাতে পড়ে দণ্ড দিতে হয়েছে কিছু। ভদ্রলোককে আর কী করা যায়, অবশ্য প্রহারেণ ধনঞ্জয় ছাড়া। কি জানি, হয়ত তাই করে বসতাম, শেষে শেলী এসে মিটমাট করে দেয়। সে রাত্রে ঘুম হয়নি গায়ের জ্বালায়।

* * * *

আবার ফিরে আসি ভ্রমণ বৃত্তান্তে। আজ যাব গুলমার্গ। সৌন্দর্যের রাণী, গোলাপ-নিকেতন, তুষারমণ্ডিত পিরপান্‌চালের গিরিকান্তার, ভারতের সুইজারল্যাণ্ড। বাস যায় টাঙ্‌মার্গ পর্যন্ত। ১৸৹ আনা করে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে আনলাম। প্রথম শ্রেণীতে চার আনা বেশী, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া চার আনা কম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে বেশ আরাম করে যাওয়া যায়। বেলা দশটার সময় ছাড়ার কথা ছিল কিন্তু ছাড়ল এগারটায়, তাও আমাদের নিরন্তর তাগাদায়। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে থেমে গেল, বলে কিনা তামাক তুলে নেবে, আবার কিছুদূর গিয়ে ঘোড়ার চানা তুলল। আরও কিছুদূরে গিয়ে খালি প্যাকিংকেস।

—কি হে? মালগাড়ী পেয়েছ নাকি? রুখে উঠলাম সবাই, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কড়া হওয়ার ফল আছে, আর কিছু তোলেনি গাড়ীতে।

গাড়ী গজেন্দ্রগমনে চলল। সহর ছাড়িয়ে এসে গায়ে যেন বল পেল। প্রথমে বারামূল্লা যাবার রাস্তা পড়ে, মাঝ পথে বেঁকে যায় ভিন্ন দিকে। সে রাস্তাটা বড় খারাপ, বুঝলাম অনেক দিন সংস্কার হয়নি।

গাড়ী চলেছে, সংগে সংগে মুখও চলেছে সামনের সারির লোকের সাথে। রাস্তার পাশেই দেখি বড় বড় গাছ। তার ছোট ছোট ডালপালা কেটে গাছের মাঝে জমা করে রেখেছে। আমাদের দেশে শীতের শেষে যেমন কুলগাছ নেড়া করে, ঠিক তেমনি ভাবে নেড়া করেছে। শুনলাম, এগুলো ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ। বিহারে দেখেছি গাছগুলো লম্বা লম্বা, আর কী মসৃণ এদের কাণ্ড, কিন্তু এখানকার ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ আমাদের দেশের আম, কাঁঠাল গাছের মত দেখতে। ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, এমনি ভাবে কেটে রাখার কারণ হল, পাতাগুলো রোদ-বৃষ্টিতে মজে থাকে। কিছুদিন বাদে এগুলো নিয়ে গিয়ে প্রথমে ভিজিয়ে রাখে, পরে সিদ্ধ করার ফলে জলের ওপর তেল ভেসে ওঠে। তারপর স্থানীয় বিশিষ্ট পদ্ধতিতে তেলের অংশটুকু আলাদা করে নেয়।

তিনি আবার বলেন—জাফ্‌রান গাছ দেখেছেন? এ পাশে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। পহেলগাঁওয়ের পথে অনেক আছে। কাশ্মীরের জাফ্‌রান পৃথিবী বিখ্যাত; ইতালি, মরক্কোর জাফ্‌রান থেকেও ভাল।

নভেম্বরের প্রথম দিকে জাফ্‌রানের ফুল ফুটতে থাকে, তখন চারিদিক গন্ধে আমোদ করে দেয়। আরও একটা প্রবাদ আছে, যে জাফ্‌রান ক্ষেতের ত্রিসীমানায় যারা বাস করে, তারা কোনদিন মাথাধরা বা সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হয় না।

বলি—যাক, পেপ্‌স্‌ আর অ্যাস্‌পিরিন কম্পানীর বরাতজোর, যে পৃথিবীর সর্বত্র জাফ্‌রান হয় না। তা হলে কবে তাদের পাত্‌তাড়ি গোটাতে হত।

আরও বলেন—জাফ্‌রানের জমি ছোট ছোট ফালিতে ভাগ করা থাকে, আর একটু উঁচু করা। একবার বীজ ছড়িয়ে দিলে তিনবছর সে গাছের পরমায়ু।

তিনবছর হয়ে গেলে গাছগুলো নষ্ট করে ফেলা হয়, কারণ তখন ফসল কমে যায়। পরের তিনবছর তাদের বিশ্রাম। সে জমিতে আর কোন জিনিষ চাষ হয় না। গাছগুলো খুব ছোট এবং লতানো, মাথা তোলার শক্তি নেই, জমিতেই পড়ে থাকে আর ফুলগুলো তাদের ঘাড়ে চেপে মাথা উঁচু করে থাকে। ভাল করে ফুটে গেলেই ফুলগুলো তুলে নেওয়া হয়, পরে তার থেকে বেছে নেওয়া হয় পরাগ। এই পরাগই আসলে জাফ্রান।

শেষে সাবধান করে দেন—কিনতে গেলে কিন্তু ঠকার সম্ভাবনা বেশী; কারণ আসল জাফ্রান চেনা বড় দুরূহ। বিরাট পাগড়ী মাথায় জাফ্রানওয়ালা এসে বলবে—এইটেই হল সেরা জিনিষ, এমন জিনিষ বাজারে আর কারও কাছে পাবেন না। আসলে হয়ত তার বার-আনাই ভেজাল।

—তাতে আমাদের আশংকার কোন কারণ দেখি না। জাফ্রান একরতিও আমরা কিনব না।

* * * *

এক পাশে পার্বত্য নদী, আর এক পাশে উঁচু পাহাড়। গাড়ীটাও সামনে বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড দেখে আনন্দে নাচতে নাচতে, আর আমাদের প্রাণান্ত করতে করতে চলে। টাঙমার্গে গিয়ে গাড়ী থেমে গেল। এখান থেকে গুলমার্গ তিন মাইল পথ। হয় ঘোড়ায় চড়ে, না হয় পায়ে হেঁটে যেতে হয়। বন্ধুরা দুজনেই ঘোড়ায় চড়তে এক্স্পার্ট, আমি Y-পার্ট অর্থাৎ হাঁড়িকাঠ বসান আছে, এখন গলা দিতে যতক্ষণ দেরী। বন্ধুদের সারা পথ তালিম দিতে দিতে এসেছি, ঘোড়া ভাড়া করে কী লাভ? পয়সা যাবে, দেখাও যাবে না ভাল করে; হেঁটে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু বাস থেকে যেই নামলাম, এক বিরাট অশ্বসমেত সহিসবাহিনী আমাদের অবরোধ করে দাঁড়াল। যার ঘোড়া গাধার সামিল, সেও বলে তারটাই সব থেকে তেজী। তেজী হোক,

হাজী হোক, আর পাজী হোক, তাতে আমার কী যায় আসে? আমরা ত আর ঘোড়া নিচ্ছিনা।

জয়দ্রথের ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হল না। শিশির আর শেলী দেখি সবাহনে শোভা পাচ্ছে, অগত্যা এই অধমও অনিচ্ছা সত্বেও ঘোড়সওয়ার হল। তবে সব থেকে তেজী ঘোড়াটাই বেছে নিলাম। আমি খোঁড়া বলে কি ঘোড়াটা ন্যাংচা নিতে হবে? এমন কোন শাস্ত্রের বিধান আছে কী?

সহিসকে বললাম—দেখ বাবা, ঘোড়ায় চড়তে টড়তে জানিনে। বিদেশে বিভূঁয়ে যেন পৈত্রিক প্রাণটা না যায়। তুমি আমার সংগে সংগে থেকো।

ভাবছেন কেন? পাকা সওয়ার করে দেব আপনাকে—এই দিকে লাগাম টানলে ঘোড়া ডানদিকে বেঁকবে, এ দিকে টানলে বাঁদিকে, এই থেমে যাবে, এই ছুটতে থাকবে···অ্যা···অ্যা।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি অবস্থা আয়ত্তাধীন। এ যেন মানুষের মত কথা শোনে। একটু করে ছুটিয়ে নিলাম বার কয়েক। কৈ? পড়ে যাবার আশংকা ত দেখিনা?

আপনারাই বলুন না, দুঃখ হয় না! আমি যেন দুগ্ধপোষ্য শিশু—এলে-বেলে। আমায় নাবালকের মত পেছনে ফেলে সব এগিয়ে গেছে কতদূর? ওদের মনে এক তিল সহানুভূতিও কি নেই! মেজাজ বিগড়ে গেল! পাল্লা দিতেই হবে। ঘোড়া ছোটাতে আরম্ভ করলাম। প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি, সাহস আরও বেড়ে গেল, এবার পুরদস্তুর ঘোড়দৌড় সুরু হল। তীরের মত ছুটে চলেছি। আর দেখতে হবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে টগ্‌বগ্‌ করে এগিয়ে চললাম। ওঃ! কী ফুর্তি! ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ, বিজয়ের আনন্দ, পরিবেশের আনন্দ! তখন কে জানত দুঃখ বাণ্ডিল বেঁধে আমার পিছু ধাওয়া করছে।

শেলী পেছন থেকে ডাকতে সুরু করেছে···হিরে···হিরে···। সে কথা তখন

কানেই আসে না।···সর্বনাশ হয়ে গেছে! খেয়াল নেই কখন ক্যামেরাটা ছিটকে পড়ে গেছে কাঁধ থেকে। ক্যামেরাটারও ফাঁড়া সুরু হয়েছে। পয়লা নম্বর হয়েছে রামবানে মিলিটারীর খপ্পরে, এখানে আর এক দফা। ঘোড়া থামালাম, কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাকে নামান গেল না একপা। এখন নামা মানে ব্যাগার খাটা, এবিষয়ে তাদের জ্ঞান টন্‌টনে। ঘোড়া থেকে নেমে যে দেখব, সে পথও নেই। ঘোড়ায় চড়তে শিখেছি, ছোটাতে পারি, কিন্তু নামতে ত শিখিনি।

সামনেই গুলমার্গ, ছবির মত সাজান বাগান, না জানি তার কত অপরূপ রূপ! বন্ধুদের মিছে মিছে আটকালাম না। শান্তিভোগ আমার একারই হোক। প্রায় আধঘণ্টা বাদে সহিসরা এল। নেমে গরু-খোঁজা আরম্ভ করলাম। বরাত ভাল, সন্ধান মিলল, তবে টেরে বেঁকে যা কিম্ভুতকিমাকার হয়েছে, দেখে কান্না পাচ্ছিল।

মনটা আরও দমে গেল গুলমার্গ দেখে। এই কি মর্ত্যের অমরাবতী? শৈলনিকেতনের রাণী—গোলাপ-নিকুঞ্জ? হতাশ না হয়ে উপায় নেই। খাঁ খাঁ করছে বিস্তৃত প্রান্তর। লোক নেই, জন নেই, চারিদিকে মহাশূন্যতার ইংগিত, মনে হয় যেন তক্ষশিলার মৃত্তিকাগর্ভে এসে পড়েছি। অতীতের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ইতিহাসের পাতায় তুলে দিয়ে, এখানকার জনসমাজ বিদায় নিয়েছেন।

পর্যটক, বিশেষ করে ইংরাজ—যারা জীবনকে ভোগ করতে জানে সৌন্দর্যে, বিলাসিতায়, দুঃসাহসিক অভিযানে—তারা গড়েছে এই সহর। তৈরী করেছে রেসকোর্স, পোলো খেলার মাঠ, টেনিস-কোর্ট, এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম গল্‌ফগ্রাউণ্ড। বড়দিনের দুরন্ত শীতে তারা ছুটত সেখানে, তুষারের ওপর স্কী আর স্কেটিং খেলার জন্যে। তখন চঞ্চলতায় মুখর ছিল গুলমার্গের পথঘাট। ক্লাব-থিয়েটার, নাচে-গানে লোকের মন আপনি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত—সেদিন প্রকৃতি আর পরিস্থিতি দুইয়ের সমন্বয়ে তা ছিল অপরূপ। ইংরাজদের সংগে সংগে এর সৌন্দর্য, স্বর্গের অমরাবতীত্বও বোধহয় পাড়ি দিয়েছে।

আমরা পরিশ্রমকে ভয় করি, চাই বিলাস আর বিশ্রাম। আমাদের জীবনের দাম নেই বলেই বোধহয় তার প্রতি এত মায়া। আমাদের অ্যাডভেঞ্চার প্রেম করা, না হয় কটা কবিতা লেখা। আর একদল ভেঞ্চার করে লাখ টাকার মাল কিনে গুদমে পচিয়ে রাখে। আমাদের জাতীয় চরিত্রে বলে, ঘোড়ায় চড়ে দুঃসাহসিক অভিযান করা ; জীবনটা হাতে করে তুষারের ওপর দিয়ে একটা লাঠি মাত্র সম্বল করে তীর বেগে ছুটে যাওয়া ; কিনা শুধু খেলার জন্যে ! না আসবে দুট পয়সা, না হবে পরকালের জন্যে এক তিল পুণ্য সঞ্চয় ! রাম, রাম ! সাধে কি আর ভারতবর্ষ আজ এত গরীব ! ইংরেজরা ভারতের সম্পদ নিয়ে এমনি ভাবে ছিনিমিনি খেলেছে, সুপরিকল্পিত উপায়ে টাকা উড়িয়ে দেশটাকে ফোঁপরা করে দিয়েছে···হরি হে দীনবন্ধু পার কর।

গুল্‌বাগিচার বিন্দুমাত্র নমুনা নেই, এ গুলমার্গ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরা যায় না। খিলেনমার্গ পর্যন্ত যাওয়া যাক। গুলমার্গের পর রাস্তাটা খারাপ, অনেক জায়গায় নির্দিষ্ট বাঁধানো রাস্তা নেই, চিনে চলতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এদিকে আমাদের বাহনগুলো পরিশ্রান্ত হয়েছে, বেশ হাঁপাচ্ছে। মাঝে মাঝে এদের বিশ্রাম না দিলে সম্পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন করতে পারে।

গাইড বলে—বাবু, এইটেই খিলেনমার্গ।

কিন্তু কোন নিশানাই যে দেখছি না ? না আছে কোন লোকালয়ের চিহ্ন, না আছে কোন নিদর্শন। দূর ! বলে কি ? লোকে কখনও এর জয়গান গাইতে পারে !

উঁ-হুঁ, এ দেখে ফিরতে পারি না। আলাপাথর এখান থেকে দশ মাইল। তা যেতে হলেও পিছ্‌পাও নই। রাতের শীতে যদি জমে যেতে হয়, তাওবি আচ্ছা। এর পর রাস্তা খাড়াই হয়ে উঠে গেছে। সহিস বলে—ঘোড়া যাবে না এখানে, পায়ে হেঁটে যেতে হবে। অত উদ্যম তখন ছিল না, তাই আস্তে আস্তে ঘোড়াটাকেই ঠেলে ওঠালাম। ভয়ও হচ্ছিল, ঘোড়া যেন আকাশ-পথে পা বাড়াচ্ছে। একবার পা পিছলে গেলে ······ভাববার আর অবসর থাকবে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে পেলাম এক বিস্তৃত উদ্যান, সামনে লম্বা লম্বা উইলো গাছ। আর ওই দেখা যায়, দূরে তুষারশুভ্র নাংগা পর্বত। মনে হচ্ছিল, ওপরের তুষারপুঞ্জ যেন গড়িয়ে আসছে আমাদের দিকে। মেঘের কী অপরূপ দৃশ্য! সূর্যের আলো যে সত্যি সাত রঙে গড়া, তা দেখার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস্ করতে হয় না। এ সৌন্দর্যের বোধহয় বর্ণনা দেওয়া যায় না—অদ্ভুত, অপূর্ব! নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারা জীবন এই স্বর্গ-সুষমা উপভোগ করলেও বোধ হয় চির-অতৃপ্তিই রয়ে যাবে।

অথচ আমাদের দেশের লোকেরা এরকম ভ্রমণকে নিরর্থক বলে উড়িয়ে দেয়। ভাবছিলাম, কোন মহাপুরুষ যদি এখানে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এর কিছু মাহাত্ম্য প্রচার করতেন, তাহলে অনেক দেশবাসী এই অনুপম সৌন্দর্য উপভোগ থেকে বঞ্চিত হত না। সতীর দেহ না হয় মাত্র ৫২ খণ্ডে ছড়িয়ে মহাপীঠের সৃষ্টি হয়েছে; এখানে নেহাৎ একটা সাধারণ পীঠ ত গড়ে উঠতে পারত। তেত্রিশ কোটী দেবতার কারও অনুগ্রহ হল না।

কারো কারো মতে, বিশ্বামিত্র মুনি যখন ক্রোধে অন্ধ হয়ে গেলেন, তখন স্থির করলেন, এক সুন্দর স্বতন্ত্র পৃথিবী গড়বেন। সেদিনকার পৃথিবীর সীমানা ছিল ভারতবর্ষ। তাই তার প্রান্তে সৃষ্টি করলেন তাঁর নিজস্ব পৃথিবী—কাশ্মীর—স্বকীয়তায় এবং সৌন্দর্যে তা হল অতুলনীয়। তারপর মন দিলেন ভারতের সমকক্ষ পীঠস্থান গড়তে এবং কয়েকটা পুণ্যধামের প্রতিষ্ঠাও করেন। তখনও তিনি অনায়াসে এখানে একটা পীঠস্থান গড়তে পারতেন।

কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ বৃষ্টি এল। শুনেছি এখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়; এখুনি নিশ্চয় থেমে যাবে। দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এল, আর সুরু হল মুষলধারে বৃষ্টি। নিরুপায়, কোন আশ্রয় নেই। যতদূর সম্ভব কাপড় চোপড় বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম। একটু বাদেই থেমে গেল, কিন্তু তার মধ্যেই আমরা ভিজে জব্‌জবে হয়ে গেছি। যে কটা পোষাক বর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছিলাম চটপট করে পরে নিলাম। ওঃ, কী শীত! হঠাৎ

কয়েক মিনিটের মধ্যে এ যেন কার্তিক মাস থেকে মাঘ মাসে টেনে নিয়ে গেল। হাড়ের ভেতর পর্যন্ত গুড়্ গুড়্ করতে লাগল। গুলমার্গে এখনও দু-একটা হোটেল আছে; পয়সা খরচ করলে বিছানাও পাওয়া যায়। কিন্তু তখন আমরা শীতে খরহরি কম্পমান; তাই ভাবছিলাম, কতক্ষণে নিজেদের ডেরায় পৌঁছব। তাড়াতাড়ি ছুটছি টাঙমার্গের দিকে, শেষ বাস যদি ছেড়ে দেয় তাহলে পথে বসব। দেখতে হবে না আর, রাতের শীতে জমে বরফ হয়ে যাব।

নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। গাড়ী তখনও হর্ণ দিচ্ছে যাত্রী আকর্ষণ করার জন্যে। আমরা আসার সময় রিটার্ণ টিকিট কিনেছিলাম। গাড়ীতে চড়তে যাচ্ছি, বলে সীট ত খালি নেই। আপনারা যাবার সময় বলে যাননি কেন, আজই ফিরবেন।

—সব রিসার্ভ হয়ে গেছে? চালাকি পেয়েছ? আমরা এখানে শীতে মরে থাকি, আর আমাদের নাকের ওপর দিয়ে বাস ছেড়ে চলে যাবে! বীরত্ব জেগে উঠল—ঠেলে উঠলাম গাড়ীতে।

তখন কনডাক্টার বলছে—আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি, তবে আমায় কিছু বকশিশ দিতে হবে।

মনে মনে বললাম—বকশিশ না ছাই দেবে। বলা বাহুল্য, কিছু দেইনি।

সন্ধ্যার পর ফিরে এলাম শ্রীনগর। যেমন ক্ষুধার্ত তেমনি পরিশ্রান্ত। চা-পর্ব শেষ করলাম। তারপর হাত-পা এলিয়ে দিলাম খাটের ওপর। মনে হচ্ছিল, শরীরটা বোধহয় আমার নিজস্ব নয়—কেমন যেন ভারী ভারী—একেবারে ভেজা কাঁথা। হাতপাগুলো তখনও যেন কালিয়ে আছে। অবসাদে চোখ বোঁজা। ভাবছিলাম, এ বোঝা কাল সকালে বইতে পারব ত?

শেলী হঠাৎ বলে—সাধে আর ভারতীয়রা এই সব দেখতে তেমন আন্তরিক আকর্ষণ পায় না! এ সায়েবদের পক্ষেই পোষায়, রুটী মাংস খেল, তার সংগে দু-এক ঢোক খেয়ে নিল। ব্যাস্, উবে যাবে ক্লান্তি, অবসাদ, যেন সিনেমা দেখে ফিরছে।

—যেহেতু সায়েবরা মদ খায়, অতএব তা বৈজ্ঞানিক বা তা স্বাস্থ্যসম্মত এমন কোন মানে আছে কী ?

—সত্যিই ত ! তাই বলে আমরা কখন আদর্শচ্যুত হতে পারি না। দেশ, কৃষ্টি, সমাজ ব্যবস্থার সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে ত ! ইংরেজদের আবার আদর্শ ! নেপোলিয়ান পর্যন্ত ইংরেজদের বলে গেছেন—A nation of shopkeepers—ওদের, জাতীয় ধর্ম দোকানদারী, ওরা মদ খেয়ে মাতাল হবে না ত কে হবে ? ওরাই ষড়যন্ত্র করে, মদ খাওয়া ধরিয়ে আমাদের দেশটাকে জাহান্নামে পাঠাল। এখন মদ্যবর্জন নীতিতে গড়ে উঠবে স্বাধীন ভারত।

—কেন ? যে যুগ বাংলার স্বর্ণ-যুগ, যে যুগের ভুরী ভুরী বাঙালী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, সেই যুগে মদ না খেলে শিক্ষিত সমাজে কল্কে পাওয়া যেত না। কলেজে পড়ে মদ না খেলে, সে কলেজের নাম ডোবাত। স্বনামধন্য রাম গোপাল ঘোষের ভাগ্নে গ্র্যাজুয়েট হয়েও মদ খেতেন না। তাই ঘোষ মশাই দুঃখ করে বলেছিলেন—তোকে আমি সমাজে বার করি কি করে ? আর এখনও কংগ্রেস সরকার 'কক্‌টেল পার্টি' দেয়।

শেলী বলে—ও একটু নির্দোষ আনন্দ ···ওতে কোন·······আচ্ছা একটু আনলে·······এই মেডিসিনাল ডোস্ ·····আর আজ আমাদেরও ত রুচী মাংস হয়েছে।

আমি ভাবি, মেডিসিনাল ডোস্—দোষের ত কিছু নেই। তবুও চক্ষুলজ্জা আর সংস্কার কিন্তু-কিন্তু-ভাব এনে দিচ্ছিল। গোড়া থেকে শিশিরকে নীরব দেখে বলি—কিরে, তুই এমন মৌনব্রত অবলম্বন করলি কেন ?

ও যেন নির্লিপ্ত হয়ে উত্তর দেয়—মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। কিন্তু দোকানে গিয়ে খাওয়া, সে সব পোষাবে না।

আসল বিধি যখন গৃহীত হল, তার সুবিধামত প্রয়োগের অভাব হবে না। দোকানে বেশী আলো বলেই তার বাজার কালো। এক পাইট দাম নিল ১৮৲ টাকা। দায়ে পড়েছি যখন তাই সই।

শিশির প্রথম আসামী। ভয়ে ভয়ে ফোটা কয়েক ঢেলে নিল, যেন শাস্ত্র রক্ষা করছে। শেলী জল ঢেলে গেলাস ভর্তি করল। আমি ভাবলাম, বোতলের গলাও যে ওরা খালি করতে পারল না—বীরত্ব দেখলাম। খাবার সংগে সংগে যেন শিরায় শিরায় ইলেকট্রিক শক্ পাস্ করে গেল। কোথায় রইল জড়তা, অবসাদ। যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেলাম। খাবার টেবল আমিই জমিয়ে রাখলাম, যেন একাই একশ। খাবারাও গিলে চলেছিলাম গোগ্রাসে। বেশ কাটছিল, হঠাৎ গা বমি বমি করে উঠল—কি জানি, অমনি ভয় পেয়ে গেলাম। আনন্দের পরিবর্তে এল আতংক, গুম্ হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। দাঁড়ান তখন সত্যিই কষ্টকর। বন্ধুরা রঙীন নেশায় হোক বা ভণিতা করেই হোক, সরস আলোচনায় মশগুল ছিল। আমি কিন্তু স্পিকটী নট। গা বমির ভাব ক্রমে বেড়ে চলেছে। চাপা দেবার জন্যে একটা হজমিগুলি খেয়ে নিলাম। মানল না কিছুই, বমি হয়ে গেল খানিকটা, তবুও নিষ্কৃতি।

প্রত্যেকদিন রাত্রে আগে গায়ে শালটা দিতাম, তারপর কম্বলটা দুভাঁজ করে চাপা দিয়ে কুঁকড়ে শুয়ে থাকতাম। আজ এত ভিজে এসেছি, তাও শীত পড়েছে বলে মনে হয় না। যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়, এই ভয়ে শালটা গায়ে চাপান ছিল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল গতকালের কোন অবসাদ টের পেলাম না। প্রতিদিনের মত তাজা মন এবং তাজা দেহ। আজ আবার বিশ্ববিজয় করতে পারি। অবশ্য জয়যাত্রা সুরু করার আগেই অষ্টাদশ মুদ্রার তরল গরলটা ঝিলামের স্রোতে বিসর্জন দিলাম।

*　　*　　*　　*　　*

আজকে ছোট প্রোগ্রাম, বারামুল্লা। ৩৪ মাইল পথ, ভাড়া দেড় টাকা। নিয়মিত বাস সার্ভিস এই দিন কয়েক হল খুলেছে। তাও নির্দিষ্ট সময় নেই, যাত্রী হলে তবে ছাড়ে। সহর পার হয়েই পেলাম চমৎকার রাস্তা। এইটেই ছিল

শ্রীনগরের সংগে বহির্জগতের যাতায়াত করার প্রধান রাস্তা—চওড়া পিচ-বাঁধান পথ। দু-পাশে লম্বা লম্বা ঝাউ গাছ। এমন চমৎকার সাজান বীথিকা, দেখলে মোহিত হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। ইতিহাস একে আরও মর্যাদা দিয়েছে, এগুলো রোপন করার ব্যবস্থা করেছিলেন জগতের আলো নূরজাহান। সুদূর তুর্কীস্থান থেকে আনিয়েছিলেন গাছগুলো।

প্রকৃতি ছেড়ে বাস্তবে আসতে হল—বনবীথি ছেড়ে রাজনীতি। যেন শেলীর স্কাইলার্ক স্বর্গের পাখী হয়ে উড়ে চলেছিল মনের আনন্দে, হঠাৎ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এসে পথ রোধ করলেন—স্বর্গটা সব নয়, পৃথিবী আছে, দুঃখ আছে, সংঘাত আছে—বলতে হল, এবার ফিরাও মোরে। এ পথে দাংগা-হাংগামা, যুদ্ধ, মারামারি ছাড়া কথা নেই। কারণ এদিককার বেশীরভাগ যাত্রীই ভুক্তভোগী। কারও ঘরবাড়ী গেছে, কারও আত্মীয় স্বজন মরেছে, কেউ বা সর্বস্ব খুইয়ে বাস্তুহারার খাতায় নাম লিখিয়েছে। এখানে যুদ্ধ হয়ে গেছে, কাশ্মীর আর আজাদ কাশ্মীর গভর্ণমেণ্টে, বেসরকারী ভাবে অর্থাৎ আনঅফিসিয়ালি ভারত ও পাকিস্থানে। যুদ্ধের চিহ্ন এখনও প্রচুর পাওয়া যাবে। বাড়ী ঘর সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে—'সে যেন এক মহা শ্মশান। অবশ্য বর্তমানে ভারতসরকারের আপ্রাণ সহযোগিতায় আবার গড়ে উঠছে সহর। একজন যাত্রী বলেন—যাচ্ছেন ত, স্বচক্ষে দেখে আসবেন। কাশ্মীরের মধ্যে বারামুল্লা ছিল একটা বিখ্যাত সহর। আজ তার কংকালসার অবয়ব। এখানে এক ঝর্ণার ধারে ছিল বিখ্যাত রঘুনাথজীর মন্দির। সে মন্দির ধ্বংস করে দিয়েছে ; বিগ্রহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ঝর্ণার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

একটা প্রশ্ন জাগল—কাশ্মীরের মুসলমানদের উদ্ধার করতে এসেছিল আজাদ-কাশ্মীর বাহিনী ; উদ্ধারলব্ধ মুসলমানদের কি ব্যবস্থা করেছিল ?

উত্তর পেলাম—হিন্দু মুসলমান পার্থক্য তারা করেনি। যাকে সামনে পেয়েছে কেটেছে। যার সম্পত্তি পেয়েছে লুটপাট করেছে, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোন কোন গ্রামে মুসলমান অমুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা হয়েছে—

হিন্দু আর শিখদের সম্পত্তি লুঠ করে, মূল্যবান জিনিষ বেছে নিয়ে শূন্যগর্ভ উচ্ছিষ্ট প্রসাদ বিতরণ করেছে গ্রামের মুসলমানদের।

এই গাড়ীতেই একজন শিখের সংগে আলাপ হল; বারামূল্লায় নাকি তাঁর জমাটি ব্যবসা ছিল। সারা জীবনের সঞ্চিত ধন এখানে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন। যখন দেখলেন আর বাঁচবার উপায় নেই, তখন বারামূল্লার আশ-পাশের গ্রামের লোক মিলে যাত্রা করেন শ্রীনগরের দিকে। তারা সংখ্যায় ছিল কয়েক হাজার, বহু মুসলমানও ছিল। মাত্র ন-মাইল যাবার পর শত্রুপক্ষের এক সৈন্যবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলে। তারপর নির্বিচারে সবাইকে হত্যা করতে থাকে; তিনি পালাবার চেষ্টা না করে সেখানেই শুয়ে পড়েন। মৃত্যুযজ্ঞ সমাধা করে তারা চলে গেল। যদি পথে আবার কেউ ধরে ফেলে, সেই ভয়ে দু-দিন তিনি মড়ার গাদার মধ্যে মৃতের ভাণ করে পড়ে থাকেন। তারপর রাত্রের অন্ধকারে পাহাড়ের পথে পালিয়ে চলে আসেন শ্রীনগরে। তাঁর স্ত্রী, তাঁর মা, তিনটী ছেলেমেয়ে কারও সন্ধান তিনি আজও পাননি।

আমরা পশ্চিমবংগে বসে অনেকে উত্তেজিত মুহূর্তে প্রতিশোধের কথা চিন্তা করি, কিন্তু কাশ্মীরের হিন্দুরা সে চিন্তা করবার সুযোগ পায় না। তারা ভাবে, যা গেছে তা ফিরে পাওয়া যাবে না, এই বর্তমানটুকুতে হাত না পড়লেই হল।

বারামূল্লায় পৌছলাম। এখানেও বাঙালী বন্ধু আছেন, এম. ই. এস. এর কর্মী। তিনি একজন স্থানীয় সংগী নিয়ে বেরোলেন সহর দেখাবার জন্যে। দেখবার মধ্যে ধ্বংসস্তূপ। পাড়ার পর পাড়া ঘররাড়ী ভেঙে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বর্তমানে অনেকে ফিরে এসে আবার সংস্কারে মন দিয়েছেন। কথার ছলে বলি, এই ধ্বংসকারীরা দাবী করে তারা কাশ্মীরের ত্রাণকর্তা? কথাবার্তা শুনে মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, গণভোট হলে কোন দিকে যাবে কাশ্মীর? ধর্মের দোহাই দেওয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সাম্প্রদায়িকতার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে, বৃহত্তর স্বার্থ ও মানবতার পথে কি আসবে? এখানকার লোকের মুখে যেন শুনলাম, হাজার দোষ থাক, পাকিস্থান ত মুসলমানের রাজত্ব।

কাশ্মীরকে যারা ছারখার করে দিয়েছে, ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে যারা অসহায় ভাবে হত্যা করেছে, একমাত্র মুসলমান বলে সেই হবে আপন জন? আরও বলেছে—আমাদের আজকের অভাবের কারণ আমাদের যাতায়াতের পথ এত দুরূহ। যদি পাকিস্থানের সংগে সংযোগ থাকত, মারীর পথ থাকত খোলা, তাহলে কাশ্মীরবাসীদের এত দারিদ্র্য ভোগ করতে হত না—তিন টাকা সের মুন কিনে খেতে হত না কোন দিন।

আমাদের পথ প্রদর্শক এখানকার লোক, তিনি মুসলমান। এই সব কথা শুনে প্রতিবাদ করে বলেন—আপনারা ভুল বুঝেছেন। আজও কাশ্মীরের সকল অধিবাসী শেখ আবদুল্লার কথায় অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে এবং ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সকেই তাদের একমাত্র নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বলে মনে করে। ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্স ও শের-ই-কাশ্মীরই হল দেশের একমাত্র আশা ভরসা। আপনারা শেখ আবদুল্লা বা ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স কারও কথাই ভাল করে জানেন না, তাই মনে এত সংশয়। আগে বরং সে কথা শুন; তখন বুঝবেন, কেন ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের প্রভাব এখানে এত বেশী, কেন শেখ আবদুল্লার ওপর দেশবাসী এত নির্ভরশীল। জানেন, মাত্র ৪২ বছর বয়সে তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বর্তমানে সব থেকে অল্পবয়স্ক প্রধানমন্ত্রী।

১৯০৫ সাল। ডিসেম্বর মাসের তীব্র শীত। নগ্ন ঝাউগাছগুলো মাছের সাদা কাঁটার মত বেরিয়ে রয়েছে। তুষারপাত চলেছে অবিশ্রান্ত ভাবে। তুষার ঝন্‌ঝা জীর্ণকুটীর আর কাঠের বাড়ীগুলোর ওপর প্রচণ্ড বিক্রম জানিয়ে যাচ্ছে। সৌর কাশ্মীরের এক গণ্ডগ্রাম। সেখানকার এক শাল তৈরীর কারখানার লম্বা ব্যারাকের দিন-গত-পাপক্ষয়-গোছের-করে-কাটান এক জনসমাজ, নির্দিষ্ট নিয়মে দিন কাটিয়ে চলেছে—দুঃখ-দুর্দশা আর দারিদ্র্যের বোঝায় তারা পংগু— আনন্দ উৎসব তাদের কল্পনাতীত। সেই ব্যারাকের এক ক্ষুদ্র কুঠরীতে জন্ম নিল এক শিশু—বোধ করি সদ্যবিধবা তার মাকে সান্ত্বনা দিতে; পাঁচ ভাই আর এক

বোনের পর জন্ম হল শেখ আবদুল্লার। তার ভায়েরা কাজ করে পশমিনার কারখানায়। সেখানকার চাষী-মজুর ছেলেরাই হল শেখ আবদুল্লার খেলার সাথী। বাল-সুলভ কল্পনা রাজ্যে ঘুরে বেড়ায় তার মন। এমনি ভাবে দিন চলে—বৈচিত্র্যহীন নিতান্ত সাধারণ দিন যাপন—শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি। জীবনের সন্ধিক্ষণ এল দৈবাৎ। তখন আবদুল্লার বয়েস বারো বছর। তারই এক খেলার সাথী, বয়েস মাত্র আঠারো বছর, কয়েকদিনের অসুখে শুকিয়ে মারা গেল। চিকিৎসক জানান, রোগের নাম—থাইসিস্।

ছেলেটির উপার্জনে নির্ভরশীল বুড়ো বাপ আর তার বোন, অন্তরের দুঃখ লাঘব করার জন্যে কান্নার সুরে জানায়, তার উপার্জন ছিল অল্প, আবার সেই স্বল্প পুঁজির মোটা অংশ নিয়ে যেত এক মহাজন, ঋণ শোধের অজুহাতে। ভাত আর ফ্যানে সংসার চলে যেত, কিন্তু নিজে বেশীরভাগ দিন থাকত উপবাসে। যৌবন চাইল শক্তি সঞ্চয়ের খোরাক, পেল উপবাস; তারই প্রতিশোধে নিল প্রাণ। আবদুল্লার মনে হল, কী মহানুভব তার বন্ধুটী। পায়ের-ঘাম-মাথায়-ফেলা অর্থে অপরকে খাইয়ে সে নিজে থেকেছে অনাহারে। কই! তার অভাবের কথা ত কোন দিন মুখ ফুটে বলেনি!

কিন্তু তার এই অকাল মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? পৃথিবীর নগ্নরূপ খুলে গেল তার চোখের সামনে—মানুষের মাঝে মানুষের কি দুর্লংঘ্য প্রাচীর—একদিকে প্রাসাদ, বিলাস, ব্যাভিচার; অন্যদিকে আর্ত অসহায়ের প্রতিকারহীন চরম দুর্দশা—অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা……এর প্রতিকার তাকে করতেই হবে—মানুষ হতে হবে—মানবতার জন্যে সংগ্রাম করতে হবে আজীবন—সর্বগ্রাসী দারিদ্র্য ও অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে হবে।

তিনি আরও দেখেছিলেন—কাশ্মীরী পণ্ডিতরা আধিপত্য করছে দেশের সর্বত্র। জম্মুর ডোগরা জাতও নিজেদের প্রাধান্য বজায় রেখেছে, আর বাকি দেশের শতকরা ৯০ জন অধিবাসী—অস্পৃশ্য অশুচি হয়ে দেশের শাসন-চক্রে পিষ্ট হয়ে চলেছে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এস. সি. পাশ করে দেশে ফিরে এলেন। সংগে এলো আরও জনকয়েক গ্র্যাজুয়েট। যাঁরা কাশ্মীরের প্রথম শিক্ষিত মুসলমানদল। ফতে কদলে তাঁরা নিয়মিত ভাবে মিলিত হতেন এক পাঠাগারে। তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কাশ্মীরের ভাগ্য। শেখ আবদুল্লা চাকরী পেলেন—বিজ্ঞানের শিক্ষক। কিন্তু মন পড়ে রইল শিক্ষকতা থেকে বহুদূরে, দেশবাসীর সমস্যা সংকুল বিধিলিপিতে—এর পরিবর্তন তাঁকে করতেই হবে।

হঠাৎ একদিন জম্মুতে এক মুসলমান পুলিশ অপমানিত হল। তাঁরা এমনই সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। ক্ষেত্র আগেই তৈরী ছিল। সভা বসল জুম্মা-মসজিদে। তারপর বিশ হাজার লোক এই যুবক আবদুল্লার নেতৃত্বে এগিয়ে চলে।...তাঁর চাকরী খোয়া গেল। বন্দী হলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে কিন্তু শাশ্বত হয়ে জেগে রইলেন দেশবাসীর অন্তরে।

পরে আবদুল্লা দেখলেন, তাঁর সংগ্রাম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। বহু হিন্দু এবং শিখও তার মুসলমান ভাইদের মত দরিদ্র। দিবারাত্র পরিশ্রম করেও পেট ভরে খেতে পায় না। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত মুসলমান পরিষদের নাম বদলে করলেন জাতীয় পরিষদ।

১৯৪৬ সাল। নতুন করে রাজনৈতিক গোলযোগ সুরু হয়েছে কাশ্মীরে। ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সের দাবী যদিও তৎকালীন কাশ্মীর সরকার মেনে নেননি, তবুও তাঁরা সহযোগিতা করছেন, ভবিষ্যতে এর ভেতর দিয়ে যদি শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধান হয়। ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সের তরফ থেকে মাত্র একজন মন্ত্রী ছিলেন—মির্‌জা মহম্মদ আফ্‌জল বেগ। তিনি দেশবাসীর পক্ষ হয়ে কয়েকটা অতি সাধারণ দাবী জানান। দাবীপূরণ চুলোয় যাক, ফলে পদত্যাগ করতে তাঁকে বাধ্য করা হয়। কারণ সে দাবী শ্রী রামচন্দ্র কাকের মনঃপূত হতে পারে না। তখন তাঁরা ঠিক করলেন, আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখিয়ে দেবেন, জনমত ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সের পিছনে।

সে সময় শেখ আবদুল্লা ছিলেন দিল্লীতে। এপ্রিল মাসের শেষের দিকে ফিরে এসে 'কুইট কাশ্মীর' আন্দোলনের জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। মে মাসের ১৬ তারিখ চিঠি পেলেন পণ্ডিত নেহেরুর; আন্দোলন স্থগিত রেখে দিল্লী যাবেন আলোচনার জন্যে। সেইমত তিনি ২০শে মে দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ করেন; পথে বন্দী হলেন, সেই সংগে বন্দী হলেন দেশের আরও কয়েকজন নেতা। দেশের সর্বত্র এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, সৈন্যবাহিনীও তৎপর হয়ে উঠল জনগণকে দমন করতে।

সে খবর পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন পণ্ডিত নেহেরু, ছুটলেন শ্রীনগরের পথে, শান্তিপূর্ণ ভাবে মিটমাট করে দেবার জন্যে। কিন্তু কাশ্মীরে তাঁর প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হল। এ বাধা মানতে তিনি কোনদিনই রাজি নন, তাই বন্দী হলেন কাশ্মীর সরকারের হাতে। সারা পৃথিবী সে সংবাদে চঞ্চল হয়ে উঠল। সেদিন পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের ব্যানার তাঁর বন্দীত্বের বার্তা বহন করেছিল। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের অনুরোধে এবং ভারতের রাজন্যবর্গের মধ্যস্থতায় তখনকার মত অবস্থা শান্ত হল, জহরলালের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হল।

সে সময় জিন্না সাহেব বলেছিলেন—Quit Kashmir Movement is an irresponsible and misconceived action। এদিকে পণ্ডিত নেহেরু, আসফআলি, দেওয়ান চমনলাল গেলেন বিচারে শেখ আবদুল্লার পক্ষ হয়ে ওকালতি করতে। অবশ্য সে উদ্যোগপর্ব তেমন সফল হল না—১০ই সেপ্টেম্বর শেখ আবদুল্লার ন-বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

এদিকে মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান ও সাম্প্রদায়িক গোলযোগে ভারত বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জহরলাল বললেন, গোলযোগ না করে ১৯৪৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং দেশবাসীর ওপর তাদের যে প্রতিপত্তি আছে, নির্বাচনের পথে তা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে। ক্রমে দেখা গেল, তাও সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষ শুধু নেতাদের জেলে পুরে ক্ষান্ত হলেন না, তাদের

সকল সভা-সমিতি বে-আইনী করে দিলেন। যারা ঘরে ঘরে গিয়ে প্রচার করত, তাদের ওপরও অত্যাচার করতে আরম্ভ করলেন। বক্‌সী গোলাম মহম্মদ তখন লাহোরে, তিনি বাধ্য হয়ে নির্বাচন-দ্বন্দে অংশ গ্রহণ না করাই সাব্যস্ত করলেন।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন দ্রুতগতিতে ঘটতে লাগল। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে এবং ভাগ হচ্ছে ভারত ও পাকিস্থানে। কাশ্মীরকেও ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে কোন এক দলে যোগ দিতে হবে, স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধিকার সে পাবে না। তখন মহারাজের মনোভাব, নিজের নির্দিষ্ট সর্তে ভারতে যোগদান করেন; কিন্তু ভারত দেশবাসীর মত ছাড়া কিছু করতে নারাজ।

মহারাজ অনেক ভেবে চিন্তে ১৯৪৭ সালের ১১ই আগষ্ট রামচন্দ্র কাককে বিদায় দিলেন। তবুও তা-না-না করে দিন কাটান। সেপ্টেম্বরের শেষে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং অক্টোবরে শ্রী মেহের চাঁদ মহাজনকে করেন প্রধান মন্ত্রী। তার সাত দিনের মধ্যেই দেখা দিল ঐতিহাসিক দুর্বিপাক। মহারাজ প্রধান মন্ত্রীর সংগে গেছেন জম্মুতে। পুঞ্চে অপর দেশের সীমান্ত-সৈন্য এসে প্রায়ই গোলযোগ করে, সে বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা পরিদর্শন করা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই এই সফরের উদ্দেশ্য। এদিকে শেখ আবদুল্লা গেছেন দিল্লীতে, জহরলালের সংগে আলাপ আলোচনা চালাতে এবং অলইণ্ডিয়া ষ্টেট্‌স পিপল্‌স কন্‌ফারেন্সের বন্ধুদের সংগে দেখা সাক্ষাৎ করতে। আর এক উদ্দেশ্য, ভারত থেকে কাশ্মীরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা। কারণ মারীর পথে কাশ্মীরে সকল জিনিষপত্র আসত, পাকিস্থান তা বন্ধ করে দিয়েছে; উদ্দেশ্য, অভাবের তাড়নায় কাশ্মীরকে পাকিস্থানে যোগ দিতে বাধ্য করা।

পাকিস্থান কাশ্মীর প্রবেশের পথে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ অবরোধ করেছে, অবশ্য বেসরকারী ভাবে; সীমান্তের কোন কোন স্থানে সৈন্য পাঠিয়ে

অরাজকতার সৃষ্টি করেছে। তাতে লোকের মনে একটা আতংকের সৃষ্টি হলেও কেউ ধারণা করতে পারেনি, এত তাড়াতাড়ি এমন সামরিক শক্তি নিয়ে পুর-মাত্রায় যুদ্ধাভিযান সুরু হবে। কিন্তু ক্রমে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, পাকিস্থান নাকি কাশ্মীর আক্রমনের তোড়জোড় করছে, এবং রামকোট-এর সীমানায় সৈন্য সমাবেশ করেছে। বড় বিপদ মানুষের সামনে এসে পড়লেও মন কিন্তু তা বিশ্বাস করতে চায় না।

সেদিন ২২শে অক্টোবর। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে দিনের আলো ফুটে উঠল, রোজকার মত ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, বৃষ্টিও হচ্ছে সকাল থেকে। শ্রীনগরের লোকেরা নিশ্চিন্ত মনে নিত্যকর্ম করে চলেছে, পর্যটকরা লেপমুড়ি দিয়ে প্রকৃতিকে গালাগালি দিচ্ছে, তাদের ভ্রমণের একটি দিন নষ্ট হয়ে যাবার জন্যে। এদিকে সীমানায় ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই, পাকিস্থানের সৈন্যবাহিনী ট্রাকে করে সীমানা ভেদ করে চলে এসেছে। রামকোট থেকে ডোমেল পর্যন্ত সকল কাশ্মীরী সৈন্য অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে পরাজয় বরণ করে। বিনা বাধায় বা স্বল্প বাধায় শত্রুসৈন্য ঝিলামের তীর ধরে শ্রীনগরের পথে এগোতে থাকে। কিন্তু সে খবর শ্রীনগর পৌছয় সন্ধ্যার পর। রাওয়ালপিণ্ডি যাবার জন্যে সকালে যে বাসগুলো বেরিয়েছিল, ভীত কম্পিত কলেবরে তারা ফিরে এল সন্ধ্যার দিকে। নির্দিষ্ট করে তারা কিছুই বলতে পারল না, তবে বোঝা গেল সেখানে প্রলয়ংকর কিছু ঘটে চলেছে। লোকের মনে জেগে উঠল সংশয়, আতংক। শেষে নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায়, নিজেদের সুবিধামত, তেমন কিছু নয় বলে অবিশ্বাসের আবরণ দিয়ে মনকে সান্ত্বনা দিল।

পরদিন বাসে মুরগীর খাঁচার মত গাদা দিয়ে, এমন কি তার মাথা, মুখ, মাডগার্ড কোথাও তিল ধারণের স্থানমাত্র অবশিষ্ট না রেখে জীবন্ত মনুষ্যস্তূপ আসতে লাগল একের পর এক। দলে দলে সর্বহারার দল সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরংগের মত আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল শ্রীনগরের বুকে, তখন আর সীমান্ত আক্রমন সম্বন্ধে লোকের মনে কোন সন্দেহ থাকল না। সংগে সংগে দেখা

দিল বিশৃংখলা ; এত বড় বিপর্যয়ের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। তখন বক্সী গোলাম মহম্মদ এগিয়ে এলেন, মোয়াহিদ মন্‌জিলে জড়ো করলেন ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সের সভ্যদের ; তাদের সাহস দিলেন, প্রেরণা দিলেন। বললেন, বৃহত্তর বিপদ আসছে সামনে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকতে। তারপর মন দিলেন, বাস্তুহারাদের কোথায় আশ্রয় দেওয়া যায়। সেদিন দুপুর বেলা শেখ আবদুল্লা শ্রীনগর এসে পৌছলেন। সরাসরি ছুটলেন মোয়াহিদ মন্‌জিলে। তাঁকে সাথে পেয়ে সবাই যেন নতুন উদ্যম পেল ; আত্মবিশ্বাস জেগে উঠল।

২৪শে অক্টোবর, বিজয়াদশমী। খবর যা আসতে লাগল তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। কেউ বলে, উরী আর ডোমেলের মধ্যে শত্রুপক্ষ রয়েছে ; কেউ বা বলে, উরী অধিকার করে তারা দ্রুতগতিতে বারামুল্লার দিকে এগোচ্ছে। যেটাই সত্যি হোক, তাদের অগ্রগতি যে অপ্রতিহত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেমনি সমুদ্রের স্রোতের মত আসতে লাগল বাস্তুহারার দল।

আতংক, বিহ্বলতা ও উৎকণ্ঠার ভেতর দিয়ে প্রাণহীন বিজয়া দশমীর উৎসব পালন করা হল। রাজদরবার যথানিয়মে আলোক-সজ্জিত করা হল, কিন্তু লোকের প্রাণে কোন আলোর রেখা দেখা গেল না—সেখানে অন্ধকার ঘনতর। লোকের মনে ত্রাসের মাত্রা গেল বেড়ে—রাত নটার পর হঠাৎ সহরের সমস্ত আলো গেল নিভে—আঁধার-দৈত্য আলোকোজ্জ্বল শ্রীনগরকে গ্রাস করল। ৪৫ মাইল দূরবর্তী মাহারায় ছিল বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাণকেন্দ্র—রাজধানীর পাওয়ার হাউস। শত্রুপক্ষ তা দখল করেছে—আলোর আশা যাচ্ছে নিভে।

২৫শে অক্টোবর, শনিবার। সেদিন বকরঈদ। তবে উৎসবের আনন্দ সংবাদ তারা বিনিময় করেনি—বিনিময় করেছে শত্রুপক্ষের অগ্রগতির সংবাদ, আসন্ন বিপদের কথা। নম নম করে প্রার্থনা সারার পর, আবদুল্লা দেশবাসীকে উদ্দেশ করে বলেন—রাজশক্তি, শক্তিহীন হয়ে বিরাজ করছে। জনগণকে রক্ষা করার ক্ষমতা তার নেই, সুতরাং তার ওপর ভাগ্য সমর্পন না করে আমাদের যা আছে, তাই নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমরা নিজেরাই

নিজেদের রক্ষা করব—দেশমাতৃকাকে রক্ষা করব—অক্ষুণ্ণ রাখব আমাদের স্বাধীনতা।

তারপরই শেখ আবদুল্লাকে দিল্লী চলে আসতে হয়। কারণ এটা সুস্পষ্ট হয়েছিল, যে সামরিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত এই বৃহত্তর শক্তিকে ঠেকাবার মত ক্ষমতা দেশবাসীর নেই। অতএব এ থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল, ভারতের সাহায্য লাভ করা। দিল্লীর সংগে যোগাযোগ সব সময় ছিল। তারপর দিল্লী থেকে ভি পি. মেনন যখন জনকয়েক সমর-বিশেষজ্ঞ নিয়ে শ্রীনগর নামলেন, দেশবাসী আশার আলো দেখতে পেল।

রবিবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, সোনার আলোয় আকাশ বাতাস ভরে উঠল; এদিকে খবর পাওয়া গেল, বিপদ বুঝে মহারাজ দেশ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। প্রাণপ্রিয় রাজমুকুট, তা কিনা ধূলায় লুণ্ঠিত—পরিত্যক্ত রাজদণ্ড গ্রহণ করে, মস্ত বড় ক্ষমতালোভীর মধ্যেও এমন কেউ নেই। বড় বড় খেতাবভূষিত রাজকর্মচারীগণও দায়িত্বের কথা ভুলে জীবন নিয়ে ছুটেছে নিরাপদ স্থানে। দেখাদেখি অন্যান্য কর্মচারীগণও আত্ম-রেখে-ধর্ম কথাটার ওপর প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিল। শুধু সিংহাসন শূন্য নয়, দেশ শাসনশূন্য—না আছে সৈন্যবাহিনী, না আছে পুলিশের দল। জনসাধারণ নিজেদের ভাগ্য নিয়ে অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। প্রতিমুহূর্তে নতুন নতুন আতংকের সংবাদ এসে পৌঁছচ্ছে। গুজব-সরবরাহ কেন্দ্র হয়েছে আমীরা কদলের প্যালাডিয়াম টকী। সেখান থেকে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রের মৌখিক বুলেটিন বেরোচ্ছে অনবরত। এদিকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের আসল খবর কেউ রাখে না।

কিন্তু সেই মহাবিপদের সময় দেশকে রক্ষা করেছিল বীর রাজেন্দ্র সিংহ ও দেশপ্রেমিক মুষ্টিমেয় অমিত বিক্রমশালী ডোগরা সৈন্য—যারা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিল, অথচ কেউ জানল না তাদের নাম। ইতিহাসের পাতায় তাদের নাম কোনদিন শোভা পাবে না, তা হবে অনধিকার প্রবেশ, সেখানে যে কেবল রাজা-মহারাজের একচ্ছত্র অধিকার।

ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে মাত্র কয়েক শত ডোগরা সৈন্য ছিল উরীতে। তাদের না আছে যুদ্ধের উপযুক্ত রসদ, না আছে প্রয়োজনীয় যানবাহন। অপরদিকে বিপক্ষদলের বিপুল সৈন্যবাহিনী, অপরিমিত অস্ত্র-শস্ত্র, আধুনিক যানবাহন। ওসব ভেবে মন খারাপ করা বৃথা। প্রাণ যতক্ষণ আছে, এক বিন্দু রক্ত যতক্ষণ ধমনীতে প্রবাহিত হবে, ততক্ষণ যুদ্ধ করে যাব, দেশকে বাঁচাবার চেষ্টা করব। দেশমাতৃকাকে অপমান থেকে বাঁচাবার সুযোগ পাচ্ছি, এই ত যথেষ্ট সৌভাগ্য। তারা জানে না, শ্রীনগরে কি হচ্ছে; তারা জানতে চায় না, মহারাজ কি করেছেন; তারা চায় কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতে।

২৩শে অক্টোবর তারা সমরোপযোগী এক স্থানে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে আশ্রয় নিল ২৪ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করেছে। তাদের ক্লান্তি ছিল না, আহার ছিল না, আশ্রয় ছিল না। তাদের ক্ষীণ সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়েছে, তবু একপাও পেছয়নি, তাদের কর্ণধারকে হারিয়েছে তবুও বিচলিত হয়নি—নেতা নেই, তার আদেশ ত আছে, তার আদর্শ ত আছে।

ইতিমধ্যে ভারতের সাথে কাশ্মীরের চুক্তি হয়ে গেল। বর্তমানে দেশরক্ষা, যোগাযোগ ও বৈদেশিক নীতি ভারতের হাতে থাকল, পুরোপুরি ব্যবস্থা ধীরে-সুস্থে করা যাবে। ২৭শে অক্টোবর বিমানযোগে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এসে পড়ে। রাজেন্দ্র সিং-এর দলবলের যে কজন তখনও চিরবিশ্রাম নেয়নি, পেল বিশ্রামের অবকাশ। তখন হেঁটে যাবার শক্তি কারও ছিল না, অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে গেল তাদের।

সেই অবসরে শ্রীনগরের বুকে চলেছে রাজনৈতিক বিপ্লব। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রাজা নেই বলে কি দেশে মানুষ নেই? রাজশক্তির অভাবে কি সবাই হবে অসহায়? ন্যাশানাল কন্ফারেন্স এগিয়ে এল। যা এত বছরের সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সম্ভব হয়নি, দেশের দুর্যোগ সেই সৌভাগ্য অচিন্তনীয় ভাবে এনে দিল।

ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সের স্বেচ্ছাসেবক ছড়িয়ে পড়ল সহরের সর্বত্র। রাস্তা-ঘাটে তারা শৃংখলা ফিরিয়ে আনল। ব্রিজ প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনীয় জিনিষের ওপর বিশেষ নজর রাখল। একদল গেল সরকারী অফিস, ব্যাংক, শস্যভাণ্ডার প্রভৃতি দেশের যাবতীয় সামগ্রী ও সম্পদ রক্ষা করতে।

বক্‌সী গোলাম মহম্মদ প্যালাডিয়াম টকীতে স্থাপন করলেন তাঁর কর্মকেন্দ্র—দেশ-শাসনের সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে কর্তৃত্ব আপনি এসে আত্মসমর্পন করল। প্রথমে তিনি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করলেন। তারপর খোঁজ করতে স্থুরু করলেন, কোথায় আছে অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ; তারও সন্ধান মিলল। আর দেরী নয়, স্বেচ্ছাসেবকরা বেরিয়ে পড়ল বন্দুক কাঁধে নিয়ে, কুচ্‌কাওয়াজ করতে লাগল সহরের বুকে। লোকে ভাবল আর ভয় কি, আমরা আর অসহায় নয়।

সেদিনই বিকেলে প্যালাডিয়াম টকীতে ওড়ান হল ন্যাশানাল কন্‌ফারেন্সের নিজস্ব পতাকা—লালঝাণ্ডার বুকে সাদা লাঙল। রাজতন্ত্রের ওপর সমাজতন্ত্রের জয়লাভের আর একটা ইতিহাস রচিত হল।

এ উৎসব হলেও আনন্দের দিন নয়—দ্বারে দাঁড়িয়ে শক্তিশালী পরম শত্রু। পারবে কি ওই ক্ষমতালোভী পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে? না পারলেও যুঝতে ত পারবে। শেখ আবদুল্লার দৌত্য সফল হল। শ্রীনগরের আকাশে দেখা দিল সৈন্যবাহিনীসহ ভারতীয় বিমান। কাশ্মীরবাসীর প্রাণে হল নতুন আশার সঞ্চার। তারা আনন্দে বিভোর হয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানাল ভারতীয় রক্ষীবাহিনীকে। এবার তারা নিশ্চিন্ত—এবার তারা নির্ভরশীল। কথায় কথায় আজ কাশ্মীরের বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইতিহাস জানা গেল।

দেরী হয়ে যাচ্ছে, তাই তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসতে হল।

বাসে যাত্রী ভরে গেছে, কেবল আমাদের জন্যে একঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করেছে—সৌভাগ্যের কথা। ফেলে চলে গেলে হয়েছিল আর কি? আজ

অনেক কিছু সংগ্রহ করে ফিরে চলেছি নৌকাগৃহে—ওটা যেন আমাদের কত কালের বাসা।

* * * * *

এবার পহেলগাঁও। ভাড়া মন্দ নয়। দ্বিতীয় শ্রেণী সাড়ে তিন টাকা। রাস্তাও কম নয়, ৬০ মাইলের ওপর। খেয়ে দেয়ে যাত্রা করলাম। বানিহাল হয়ে যে পথে এসেছিলাম কাশ্মীর প্রবেশের সময়, বাস সেই পথে এগিয়ে চলে। শ্রীনগর থেকে ১৬ মাইল দূরে অবন্তীপুর। অবন্তীবর্মা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন ৮৫৮ থেকে ৮৮৩ খৃঃ পর্যন্ত। তাঁর নাম অনুসারে এখানকার নামকরণ হয়েছে অবন্তীপুর। তিনি এখানে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আজ সে মন্দির নেই, পড়ে আছে তার ধ্বংসাবশেষ! কারুকার্য অদ্বিতীয়, কাশ্মীরের অন্যত্রও এর তুলনা মেলা ভার। রাস্তার ধারেই এই মন্দির, সুতরাং পহেলগাঁও যাবার মুখে দেখার অসুবিধা হয় না। আবার গাড়ী এগিয়ে চলে। এখান থেকে মাত্র এক মাইল দূরে অনন্তনাগ; কিন্তু বাসের ভিন্ন পথ, তাই দেখা হল না। দুপুরে পৌছলাম মাটন। নামটা অপভ্রংশ, মায়্টণ্ড বা মার্তণ্ড থেকে এসেছে বলে মনে হয়।

বাস থামতে না থামতেই মনে পড়ে গেল পুরীর পাণ্ডার কথা। এরা নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত। পাণ্ডারা বিরাট ঝোলা পিঠে নিয়ে আমাদের ঘিরে দাঁড়াল। এদের ঝোলা দেখে মনে হচ্ছিল, একি ছেলেধরার ঝোলা নাকি? তা আকার যা, ছেলে কেন ছেলের বাবাকেও অনায়াসে গলাধঃকরণ করে নিতে পারে। ভণিতা নেই, জড়তা নেই, সোজা প্রশ্নবান—আপকো মাকান? যতক্ষণ না কোন পাণ্ডা গেঁথে ফেলছে, একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হবে।

শেলী বলে—আমার বাড়ী কাশ্মীর।

শিশির বলে—মর্ত্যধাম।

আমি বললাম—লণ্ডন।

তাতেও নিষ্কৃতি নেই। শেষে বললাম—দেখ, আমরা পুণ্যসঞ্চয়ে আসিনি, চোখের সাধ মেটাবার জন্যে এসেছি। ভূস্বর্গ দেখতে এসেছি, স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করতে আসিনি।

—যদি দেখতেই এসে থাকেন ত আমাদের সংগে চলুন। দেখাব, বুঝিয়ে দেব—ভাবুন না কেন, আমরা হোটেল এবং গাইডের সমন্বয়।

এইরে, কাত করে ফেলে যে! তাড়াতাড়ি ধামাচাপা দেবার জন্যে বলি—থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। আমাদের যা সামান্য বিদ্যে-বুদ্ধি আছে, তাতে নিজেরাই দেখে নিতে পারব। সাধাসাধি করতে হবে না, যদি প্রয়োজন হয় নিজেরাই যেচে পাণ্ডার হাতে প্রাণটা উৎসর্গ করব।

কে ইতি মধ্যে বুঝে নিয়েছে আমরা বাঙালী। বলে আমার কাছে আসুন, আপনার পরিচয় খাতা থেকে বার করে দেব; যদি না পারি আমি ব্রাম্হণই নয়। বানার্জি, চাটার্জি, ভট্টাচারি, হাওলদার, ঘোষ, বোস,···কি বলুন না?

শেলী বলে—আমার নাম ড্যানিয়েল রাবার্ট নরসিং, পারবে বার করতে?

—সত্যি যদি নাম দেখতে চান তাহলে পারি।

আশ্চর্য লাগে এদের আত্মবিশ্বাস দেখে। শুনেছি এ বিষয়ে এরা অদ্ভুত পারদর্শী। ঝোলাস্থিত ওই পর্বতপ্রমাণ খাতার ভেতর থেকে ঠিক নাম খুঁজে বার করবে।

রাস্তার ধারেই বাঁধান কুণ্ড। ঝর্ণার জল বেঁধে এই কুণ্ডের সৃষ্টি, তার মাঝখানে একটা মন্দির। জলটা বেশ স্বচ্ছ, আর বড় বড় মাছে ভর্তি। অবশ্য তাদের সযত্নে পুষে রাখা হয়েছে, মারবার অধিকার কারও নেই। পাশে তিনটী ছোট ছোট মন্দির আছে।

শুনলাম আসল মার্তণ্ডের মন্দির এখান থেকে মাইলখানেক দূরে। ধ্বংসাবশেষ অবস্থায় পড়ে আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গড়া। এই মন্দির মাথা অনেক দিনই হারিয়ে ফেলেছে, শুধু তার দেওয়ালগুলো বর্তমান। এত উঁচু

মন্দিরও বড় একটা নজরে পড়ে না। উচ্চতায় এখনও ৬০ ফিট পাওয়া যায়। এই ভগ্নাবশেষ প্রাচীন মন্দিরের কারুকার্য দেখে আশ্চর্য হতে হয়। মন্দিরটী নির্মাণ করেন বামাদিত্য। প্রায় তিনশত বৎসর পর ললিতাদিত্য এর সংস্কার করেন। পহেলগাঁওয়ের শেশনাগ থেকে একটা শাখানদী চলে গেছে এর পাশ দিয়ে। কাছেই এক গুহামন্দির, সেও দেখার মত। সেটা আরও প্রাচীন, খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত হয়।

যে পাণ্ডাকে নিয়ে এতক্ষণ বসে বসে ঠাট্টা তামাসা করেছি, পহেলগাঁওয়ে নামতেই দেখি সে একটা কেউ-কেটা হয়ে গেছে। তার এত কাজ যে নাগাল পাওয়া ভার। সে যাত্রী ঠিক গুছিয়ে নিয়েছে। জানালে, এই পহেলগাঁওয়ে তার নিজস্ব চারখানা বাড়ী আছে। শেষে খুলে বলে—আমাদের আর সে দিন নেই। যাত্রী কই; আর যাও বা আসে, আপনাদের মত কোট-প্যাণ্ট পরা; সাহেব সেজে চলেন, হোটেলে গিয়ে দিন কাটান। আমরা হয়ত হোটেল থেকে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারি, কিন্তু আমাদের নামটাই তাদের মনকে আতংকিত করে তোলে, আমরা যেন বাঘ-ভাল্লুক। তবুও শ্রাবণ-পূর্ণিমার উৎসবে দু-পয়সা হত। বর্তমানে যুদ্ধের দৌলতে তাও গেছে।

—কি, অমরনাথ দর্শন? শুনেছি সে ত সরকারের তত্ত্বাবধানে?

—পুরোপুরি নয়; ব্যাপারটা বলি শুনুন, তীর্থযাত্রীরা শ্রাবণের অমাবস্যায় শ্রীনগরে মিলিত হত। তিন দিন ধরে চলত নানান উৎসব, ধর্মকথা। তারপর আমাদেরই সাহচর্যে অনন্তনাগ, মার্তণ্ড প্রভৃতি ঘুরে দশম দিনে পহেলগাঁও পৌছয়। যাত্রীদের আগে আগে চলে ছড়ি। ছড়ি আর কিছুই নয়, দুটি রূপ-বাঁধান বড় বড় লাঠি, নির্দিষ্ট পাণ্ডার দল বয়ে নিয়ে চলে। পিছনে পিছনে চলে যাত্রীদল, ডাক্তার, বদ্যি, দোকান-পাট অর্থাৎ ছড়ির সংগে সংগে এগিয়ে যায় একটা চলন্ত সহর। সে অনেক আগের কথা, যখন মহারাজ সকল ব্যয়ভার বহন করতেন; সকল যাত্রী ছড়ির প্রসাদ পেত। বর্তমানে কেবল চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার বহন করেন, যাত্রীরা আমাদের আশ্রয়েই থাকেন। পূর্ণিমার

দিন দেব-দর্শন করে যে যার ঘরে ফিরে আসত। তাতেই আমাদের সারা বছরের সংস্থান হয়ে যেত। বর্তমানে সব রাস্তাই বন্ধ। এই কথা বলে যে কজন যাত্রী বাগাতে পেরেছিল, তাদের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

এত গল্প হবার পর তাকে লিখে দিতে বাধ্য হলাম—আমাদের নাম, ঠিকানা, বংশপরিচয়। এও লিখে দিলাম, যে আমরা তার পাণ্ডাত্ব স্বীকার করে তীর্থদর্শন করলাম। এ প্রতিশ্রুতিও আদায় করে নিল, যদি কোন দিন অমরনাথ দেখতে যাই বা আমাদের বন্ধুবান্ধব কেউ যায়, যেন তার আশ্রয়ে ওঠে। সে কথা বলতাম ঠিকই, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার নাম ঠিকানা লেখা কাগজটা গেছে হারিয়ে।

* * * * *

শিবরাত্রির সলতে হয়ে খালসা হোটেল এখনও বেঁচে আছে। যাত্রীতারণ ব্রত নিয়েছে। এখানকার হৃত গৌরব চোখ মেললেই দেখা যায়। রাস্তার দু-পাশে দোকানের রঙ-বেরঙের সাইন বোর্ড শোভা পাচ্ছে, আর দরজায় আঁটা তালা। সহরটা ছোট, বিদেশী যাত্রীদের জন্যে গড়া। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা, তাতে রুক্ষতা নেই, সবুজ রঙে ঢাকা, কেমন কমনীয়। তার মাঝখানে ক্ষীণ অথচ খরস্রোতা পার্বত্য শেষ-নাগ নদী নানা অংগ-ভংগী করে এঁকে বেঁকে চঞ্চল গতিতে এগিয়ে চলেছে। নদীর ধারে ধারে ইতস্ততঃ দু-একখানা বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী; দেখলে মনে হয়, ছোট ছোট জিনিষই দেখতে সব থেকে সুন্দর। পোষ্ট-অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস, ছোট চার্চও বাদ যায়নি।

এদিক ওদিক ঘুরে, ফিরে এলাম খালসা হোটেলে। এক ভদ্রলোক সপরিবারে বসে আছেন। সংখ্যায় চারজন, তিনি, তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে মেয়ে। সবাই যেন ঝোড়ো কাক। মুখে পরম ক্লান্তির ছাপ; যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে এসেছে। তীর্থক্ষেত্রে আর পর্যটক-নিকেতনে পরস্পর আলাপ জমাতে বেশী বেগ পেতে হয় না—এ এটিকেট বিরুদ্ধ নয় বা চক্ষুলজ্জার ক্ষেত্রও এতে নেই। প্রত্যেকেই চুলবুল করে আলাপ করবার জন্তে। যারা দেখেছে, অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গর্ব বোধ করে; যারা দেখেনি, ভ্রমণের আগেই ভ্রমণ-বিশারদ হবার আশায় তথ্য সংগ্রহ করে। আলাপ জমে উঠল। তিনি সপরিবারে অমরনাথের উদ্দেশ্তে যাত্রা করেছিলেন, তবে তাঁকে অতটা পুণ্য-সঞ্চয়ের অধিকার দিতে বোধহয় শ্রীভগবান ইচ্ছুক নন।

তীর্থযাত্রীরা পদব্রজেই অমরনাথের পথে যাত্রা করেন, তবে সখের ভ্রমণকারীরা অশ্ববাহন সংযোগে চলেন। কোন যাত্রী যাতে ঠকে না যায়, তাই ভিসিটার্স ব্যুরো অমরনাথ যাবার ঘোড়ার ভাড়া বেঁধে দিয়েছেন ১৮ টাকা। অবশ্ব বর্তমানে যাত্রীর অভাবে, দরদস্তর করলে ১০ টাকায়ও পাওয়া যায়। ২৮ মাইল পথ। অশ্বারোহণে গেলে তিন দিনের মধ্যে পুণ্যের থলিটী ভারী করে ফিরে আসা যায়।

—আপনারা কতদূর গিয়েছিলেন? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, যেন বাঘের থাবা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছেন?

—অনেকটা তাই বটে। সেদিন পরিষ্কার আকাশ। এত সুন্দর আবহাওয়া বড় একটা দেখা যায় না। সকালে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে পড়লাম, বাবা অমরনাথজীকী জয় বলে। ধীরে-সুস্থে এগিয়ে চললাম। তাড়ার কিছু নেই। আজ অমরনাথ পৌছতে পারব না, আবার পহেলগাঁওয়ের নিরাপদ আশ্রয়েও ফিরে আসব না। বেশী চড়াই-উৎরাই নেই, রাস্তা প্রায় সমতল বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই বেশ চড়াই পেলাম। শেষনাগ নদী চল-চঞ্চল গতিতে রাস্তার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেচে—কেমন স্বচ্ছন্দ নৃত্যভংগী। তার জল দুধের মত সাদা, তাই নাম হয়েছে দুধ-গংগা। পুণ্যকামীরা দুধ-গংগায়-স্নান করার পুণ্য ভুলেও হারায় না।

আমরা এগিয়ে চললাম। এবার চন্দনওয়ারী। ন-মাইল পথ এসেছি।

দু-পাশে নদী বয়ে চলেছে, মাঝখানে বিস্তৃত ভূখণ্ড। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিলাম, যা আমাদের থেকে আমাদের বাহনের বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ঝুলি থেকে খাবার বের করলাম। উদর মহাপ্রভু অনেক্ষণ থেকে বীর-বিক্রমে তার গভীর অসন্তোষ জানাচ্ছে।

এবার আরও খাড়াই। চড়তে গেলে আতংক লাগে। সহিস বলে, এই জায়গার নাম পিশুঘাটী। স্থানীয় শব্দকল্পদ্রুমে পিশু অর্থে মাছি। মাছির উপদ্রবে তিত-বিরক্ত হয়ে লোকে এই নামকরণ করেছে।

প্রশ্ন করলাম—কথাটার স্বার্থকতা টের পেয়েছেন ?

—আমরা অবশ্য হাড়ে হাড়ে টের পাইনি, কারণ ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছিলাম। তবে উপদ্রব যে করে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর তখন আমাদের মন পিশু থেকে শিশু পথের দিকে বেশী আকৃষ্ট ছিল।

এতক্ষণ গাছ-পালা, বন-জংগল ছিল, এবার যেন ন্যাড়া পাহাড়। তুষারশুভ্র গিরিশৃংগ চারিদিক বেষ্টন করে রয়েছে। চন্দনওয়ারী থেকে পাঁচমাইল দূরে সমতল ভূমি পেলাম, এর নাম জজপাল। গরম পোষাকে আপাদমস্তক মোড়া, তাতেও শীত করতে লাগল। যেন হাড়ের ভেতর থেকে কাঁপুনি আসছে ; বাইরের যোগাযোগের পরোয়া করে না। বেশ অনুভব করতে লাগলাম, কেমন যেন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। ছেলে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, কষ্ট হচ্ছে নাকি ? অত্যুৎসাহেই হোক বা রক্তের তেজেই হোক বলে, না কোনই অসুবিধা হচ্ছে না।

এবার পেলাম শেষনাগ হ্রদ। কী অপূর্ব দৃশ্য। চারিদিক পাহাড় দিয়ে ঘেরা। কোন্ উঁচু ঝর্ণা থেকে জল আর তুষার গড়িয়ে পড়ছে। কী স্বচ্ছ নীল জল, তারই বুকের ওপর ইতস্ততঃ ভেসে বেড়াচ্ছে শুভ্র তুষারপুঞ্জ। খিড়কী দোরের সামান্য ফাঁক দিয়ে চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে, একটা ছোট্ট জলধারা ! এরই পরবর্তী রূপ হল বিশাল শেষনাগ নদী। এই সামান্য উৎস থেকে জন্ম নিতে পারে এত বড় নদী, তা বিশ্বাস করা সত্যিই কঠিন।

সমস্ত কষ্ট বোধহয় সৌন্দর্যের মহিমায় অনুভূতির বাইরে চলে গিয়েছিল। এর মাইলখানেক দূরে বায়ুযান—অমরনাথ তীর্থের টোল আদায়কেন্দ্র। স্বয়ং ভগবান যেখানে প্রার্থী, তার দক্ষিণা সামান্য নয়—মনুষ্য জীবন। বায়ুযান অর্থাৎ বেগবান বায়ু। বহুবার ঝড়-ঝন্ঝা, হিমপ্রবাহ বয়ে গেছে এর ওপর দিয়ে। শীতে, আশ্রয়ের অভাবে, কত যাত্রী প্রাণ হারিয়েছে। তাঁবুর মধ্যে যারা আশ্রয় নেয়, তারাও নিশ্চিন্ত নয়। কতবার তাঁবু উড়িয়ে নিয়ে গেছে ঝড়ে; হিমপ্রবাহ রচনা করেছে তাদের সমাধি। উচ্চতায় মাত্র ১২,০০০ ফিট, কিন্তু শীত যেন ২৪,০০০ ফিট উচ্চতার।

হঠাৎ দেখলাম সহিসদের মুখে যেন ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে বলে মনে হল। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। ভয় হল, কি জানি আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে নাকি? তা মেরে ফেলে দিলেও উদ্ধারের ক্ষীণ আশাও নেই। এখানে না আছে জনপদ, না আছে কোন পক্ষী বাহিনী। এরাই ত এখানকার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। এরা অমরনাথ নিয়ে যেতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে অমরধামে পাঠাতে পারে। হঠাৎ একজন বলে—বাবু, তুসারপাত আরম্ভ হল বলে, তাড়াতাড়ি আশ্রয়ে যেতে না পারলে এই বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে বড় মুসকিলে পড়বেন।

যাক, তাহলে এরা আমাদের প্রাণরক্ষার জন্যে ব্যস্ত। চললাম দ্রুত গতিতে কিন্তু আশ্রয়ে পৌছবার অবসর দিল না। কী সাংঘাতিক বর্ষণ। তুষারপাতের সৌন্দর্যের গল্প শুনেছি, সিনেমায় দেখেছি, পেঁজা তুলোর মত গড়িয়ে পড়ছে—কী অনুপম, কী উপভোগ্য। কিন্তু এ যেন মনে হল, ঢিলিয়ে মেরে ফেলতে চায়। ওয়াটারপ্রুফটা বাচ্চাদের গায়ে জড়িয়ে দিলাম। শীতে, ভয়ে, আশংকায় তারা দিশেহারা হয়ে পড়ে ছিল, আতংকগ্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিল। যাক নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম এই ভেবে, যে কাঁদবার শক্তি তাদের আছে। আমার সে শক্তিটুকুও বোধহয় ছিল না। সহিসরা পথ দেখিয়ে ডাক বাংলোয় নিয়ে গেল। মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়ে তখনকার মত নিশ্চিন্ত হলাম।

ভাবলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসব থেমে যাবে। আবার নতুন আলো, নতুন আনন্দ। এ কষ্টের কথা মনে থাকবে না। যে সৌন্দর্য, যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেলাম তা অপরিসীম। কল্পনার চোখে তখনও ভাসছে, বাবা অমরনাথ—অমরনাথের গুহা-মন্দির—তার পরিবেশ, তার বিশালতা। এখান থেকে মাত্র ১২ মাইল পথ। ৮ মাইল দূরে পঞ্চ-তরনী বা পঞ্চ-তর্ণী। চড়াই ভাঙতে হয় ১৪,০০০ ফিট পর্যন্ত, তারপর নেমে চলেছে পথ। সেই তুষারধবল গিরিশৃংগ, প্রকৃতির হাতে গড়া রঙ্-বেরঙের ফুলের বাগান। পাঁচটী নদী পাশাপাশি চলেছে সামান্য ব্যবধান রেখে, তাই নাম হয়েছে পঞ্চতরণী। এই পাঁচটী নদী মিলে হয়েছে অমরগংগা। তাছাড়া কোথাও তুষার শৈল, কোথাও বা তুষারস্তূপ, নদীর বুকের ওপর ভাসমান তুষার সেতু, কোথাও বা তুষারাস্তৃত যাত্রা পথ। রাস্তা বড় পিছল, খুব সাবধানে চলতে হয়। তারপরই অমরনাথের গুহা। গুহাটি বিরাট। তার মুখগহ্বর ১৫০ ফিট। তাতে তিনটী মূর্তি আছে —দেবাদিদেব মহাদেব, জগন্মাতা পার্বতী আর সিদ্ধিদাতা গণেশ। গুহার যেখানে সেখানে জলধারা বইছে। এমন কোন জলধারা থেকেই দেবতার আবির্ভাব। শুক্লপক্ষের সংগে সংগে দেবমূর্তি শশিকলার মত দিনে দিনে বাড়তে থাকে, পূর্ণিমার দিন পূর্ণাংগ মূর্তি; আবার কৃষ্ণপক্ষের সংগে সংগে ক্রমশ ক্ষীণতর হতে থাকে। অবশ্য এই ক্রমবিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া দুষ্কর—এ কিংবদন্তী। কোন যাত্রী দু-তিন ঘণ্টার বেশী সেখানে থাকেন না এর সত্যাসত্য পরীক্ষা করার জন্যে।

স্বামী বিবেকানন্দ এই গুহার সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন—**Large enough to hold a cathedral and the great ice Shiva in a niche of deepest shadow seemed as if throned on its own base.** তিনি তাঁর পাশ্চাত্য শিষ্যকে বলেছেন—**The very Lingam was the Lord Himself. It was all worship there—I never had been to any thing so beautiful, so inspiring.**

শ্রাবণ পূর্ণিমার দিন নাকি দুটী পায়রা এসে মন্দিরের গায়ে বসে। প্রবাদ, এই পায়রা দেখার সৌভাগ্য সবার হয় না। এরাই স্বয়ং ভগবান। হর-পার্বতী পায়রার রূপ ধরে তাঁদের ভক্তদের দেখতে আসেন।

—আপনি কি গিয়েছিলেন নাকি? যেন মনে হচ্ছে স্বচক্ষে দেখার বর্ণনা।

—সে সৌভাগ্য আর হল কৈ। আর এক আত্মীয় গিয়েছিলেন, তাঁর কাছে গল্প শুনে শুনে মনে হয়, যেন সব চোখের সামনে ভাসছে।

—তারপর আপনার কি হল?

তিনি আবার বলতে থাকেন—রাত বাড়তে লাগল; তুষারপাতও যেন তার সংগে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল। কী প্রচণ্ড শীত। হাড় যেন ভেতর থেকে কুঁকড়ে যাবার উপক্রম। সহিসরা আমাদের কষ্ট দেখে সেই তুষার-বৃষ্টির মাঝে বেরিয়ে গেল কাঠ জোগাড় করতে। কোন্ বনবাদাড় থেকে কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে এল। সারা রাত ধরে সেই আগুন জ্বালিয়ে রাখলাম। সমস্ত শীতের পোষাক গায়ে জড়িয়ে তার ওপর দু-খানা কম্বল মুড়ি দিলাম, সামনে আগুন জ্বলচে, তাও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিলাম।

ঘড়ি দেখে বুঝলাম দিন হয়েছে, কিন্তু আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন নেই। সহিসরা আবার বেরোল খাদ্য সংগ্রহে; দুধ আর ডিম কোত্থেকে সংগ্রহ করে আনল। টগ্‌বগ্ করে জল ফুটছে, নামিয়ে চা দিলাম, অথচ লিকার হয় না মোটে; কোন রকমে চা তৈরী হল। চুমুক দিয়ে মনে হচ্ছিল যেন ঠাণ্ডা জল খাচ্ছি। খাওয়া দাওয়ার কথা তখন প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। কারও মুখে কথা নেই, সবাই নিঝুম, চোখের পাতা বোঁজে না। তীক্ষ্ণ শীতে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, হাড়গোড় শুদ্ধু বোধহয় বরফ হয়ে যাবে। ওঃ! এক মুহূর্ত যেন ঘণ্টার মত মনে হচ্ছিল। এমনি ভাবে যখন বেলা পড়ে এল, তখন সত্যি হতাশ হয়ে পড়লাম। নাঃ, কোন উপায় নেই! তুষারগর্ভে হবে আমাদের সমাধি! জনসমাজের বাইরে, গিরি-গহ্বরে, হিমপ্রবাহে এমন ভাবে জীবনের শেষ নিশ্বাস

ত্যাগ করতে হবে! মৃত্যু এত কাছে—ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! এই দুটি শিশু। এরাও কি হবে আমাদের সংগের সাথী! সহিসরা অনবরত সাহস দিয়েছে—বাবু, কিছু ভয় করবেন না; আমরা নিশ্চয় পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনাদের কোন চিন্তার কারণ নেই।

চিন্তা করব না ভাবলেই কি চিন্তা এড়ান যায়? আরও মনে হল, কেন মরতে সাইকলজি বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়েছিলাম। তার থিওরীটা বার বার মনে পড়ছিল—ভুলবার জন্যে যত চেষ্টা করবে তা মনকে তত আঁকড়ে ধরবে। কাজের মধ্যে আগুনে কাঠ ঠেলে দেওয়া, আর অথর্ব ঘড়ির দিকে তাকান। এর কচ্ছপের গতিও নেই—যেন গতিহীন।

আস্তে আস্তে আবার রাত ঘনিয়ে এল। ঠাণ্ডা আরও বেড়ে চলেছে। উপলব্ধি করার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলছি ক্রমে। হাতপাগুলো যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। রাতের শেষেও যখন সূর্যের আলোর রেখা পেলাম না, তখন যেন একেবারেই নিশ্চিন্ত হলাম। কোন উদ্বেগ নেই। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, চিন্তা বাড়ান অনর্থক।

কিছুক্ষণ পরে যখন সহিসরা এসে সাড়ম্বরে ঘোষণা করে গেল—বাবু, কমে এসেছে তুষারপাত, একটু বাদেই হয়ত থেমে যাবে। সে কথা বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার কাছ থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে ক্ষুণ্ণমনে তারা ফিরে যায়, চেয়ে থাকে আকাশপানে।

আশ্চর্য ওদের অনুমান শক্তি; সত্যি থেমে গেল কিছুক্ষণ বাদে। আকাশ ঘোলাটে থাকলেও দুর্যোগের আভাস ছিল না। শুধু আমার নয়, দেখলাম এত আনন্দেও কারও উচ্ছ্বাস নেই, সবাই মূক হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে পড়লাম। এ সময়ে চলা বড় বিপদজনক। রাস্তাঘাট দেখা যায় না, কোথাও ঘোড়ার পা ডুবে যায় তুষারে, কোথাও এমন পেছল, যে কোন মুহূর্তে আছাড় খেতে পারে। অতি সন্তর্পনে নেমে চললাম। সাত আট মাইল নেমে আসার পর আর কোন অসুবিধে ভোগ করতে হয় নি।

বললাম—তখন অন্য কোন যাত্রীদল অমরনাথে ছিল না ?

—তা জানি না। কেউ ত ফিরে আসেনি। তাই ভাবছি কেউ বোধহয় ছিল না। অবশ্য ঠিক বলা যায় না, পুণ্যের বোঁচকা বগলদাবায় পুরে অমরনাথ থেকে অমরধামে কেউ চলে গেল কি না। তবে আর একদল যাত্রা করেছিল বার-চোদ্দজন যুবক মিলে, তারা চন্দনওয়ারী পর্যন্তও পৌছতে পারেনি।

*   *   *   *   *

বাসের কাছে চাঞ্চল্য দেখে তাঁর কাছ থেকে চলে এলাম। আর এক বিপদ, বাসওয়ালা বলে সীট নেই, সব ভাড়া হয়ে গেছে। এরা এক মামদোবাজী পেয়েছে। শ্রীনগর থেকে ছাড়বার আগে বলেছি আজ ফিরে আসব আর এখন বলে সীট নেই। শেষ পর্যন্ত ফয়সলা হল; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই, তৃতীয় শ্রেণীতে যেতে হবে। কি আর করা যাবে। অবশ্য সেদিন প্রথম দ্বিতীয় মিলে সব তৃতীয় ছাড়িয়ে চতুর্থতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

মানুষের গাদা দিয়ে বাস ছেড়ে দিল। কারও পিঠে একজনকার মাথা, কারও কোলে অপর একজনের নিতম্ব, কারও হাতের ওপর অন্যজনের দেহভার। গাড়ী যখন পাথরে ধাক্কা খেয়ে ঝাঁকানি দিচ্ছিল, সবাই মাংসপেশীগুলো সজাগ করে আঘাত সহ্য করবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল। এর মধ্যেও কিন্তু গল্প বন্ধ নেই, সবাই যে যার অভিজ্ঞতা বলতে ব্যস্ত। কে কতটা উঠতে পেরেছে, কে কতটা তুষার ঝন্‌ঝার থাপ্পড় খেয়েছে, সেই গল্পে মস্‌গুল। আমরা যেন একঘরে। চোরের মত বসে রয়েছি। মুখ ফুটে বলার কিছু নেই। আমরা পহেলগাঁও গিয়ে আর এগিয়ে যাইনি, তাই যেন এক মস্ত অপরাধ করে ফেলেছি। আমরা দেখিনি, আমাদের ইচ্ছে। তাই বলে ওরা এমন বক্রদৃষ্টিতে দেখবার কে ?

বললাম—আমরা এসেছি প্লেশ্‌-আ ট্রিপ-এ, আনন্দ উপভোগ করতে। হাতপা ভাঙ্‌তে, উপবাস করতে বা শীতে জমে যেতে আসিনি। যারা সত্যিকারের অভিজাত সম্প্রদায় তাদের জন্যে এ লান্‌ছনা নয়। তারা কোন দিন কষ্ট করে নি, করবে না। একটা উদাহরণ শুনলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে :

ইংরাজরা সসৈন্যে এল লক্ষ্মৌ দখল করতে। যখন তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল, প্রায় সবাই পালিয়েছে। নবাব ওয়াজিদ আলী বুঝলেন এখন পালানই সংগত। কিন্তু পালাবার উদ্যোগ করতে গিয়ে দেখেন, তাঁর পাদুকাযুগল মুখ ঘুরিয়ে আছেন। তিনি না নবাব! নিজে জুত ঘুরিয়ে নিয়ে পরতে হবে! শূন্য প্রাসাদে হাঁক ছাড়লেন—কৈ হ্যায়। শেষ পর্যন্ত জুত ঘুরিয়ে দেবার লোকের অভাবে তাঁর আর পালান হল না। বন্দী হলেন ইংরাজের হাতে।

মার্তণ্ডে একদল যাত্রী নেমে গেলেন। তাঁরা মার্তণ্ডের গুহা-মন্দির দেখবেন। তারপর যাবেন ছ-মাইল দূরে অনন্তনাগ। সেটা একটা ত্রিভুজাকৃতি বিশিষ্ট পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। তার নিচে গন্ধকযুক্ত গরমজলের কুণ্ড আছে। তাছাড়া একটা ঝর্ণার জল দুই বাঁধান কুণ্ডের ভেতর দিয়ে হুড় হুড় করে এগিয়ে চলেছে। তার ওপর একটা মন্দির। সহর হিসেবে অনন্তনাগ বেশ বড় এবং কাশ্মীরের অন্যতম ব্যবসা-কেন্দ্র।

শুনলাম, অনন্তনাগ থেকে ছ-মাইল দূরে আচ্ছাবল উদ্যান, সম্রাট সাজাহানের বিলাসকুঞ্জ। পাহাড়ের জল নেমে এসে খালের আকারে এগিয়ে গেছে বাগানের মাঝপথে। তার চারিদিকে অসংখ্য ফোয়ারা, নানা রকম বনলতায় ঘেরা, তাতে রঙ্‌বেরঙের ফুল; দু-পাশে চানার গাছের বীথিকা। মাঝে মাঝে আপেল ও আঙুর গাছ।

তারই দশ মাইল দূরে কুকেরনাগ ঝর্ণা। এই জল নাকি কাশ্মীরের সকল ঝর্ণা থেকে উপাদেয়। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও খুব সুন্দর। আরও কিছু দূরে ভেরীনাগ, বানিহালের পাদদেশের ঝর্ণা। একটা বিরাট

আটকোনা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই জলাধার; স্বচ্ছ অথচ ঘন নীল জল। প্রায় ৫০ ফিট গভীর। নানান রকম মাছে পরিপূর্ণ এই ভেরীনাগ। এ চন্দ্রভাগা নদীর গোপন উৎস। এর সামনে এক সুসজ্জিত উদ্যান, যা সুন্দরের উপাসক সম্রাট জাহাংগীর নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এখানে এত আসক্ত হয়ে পড়েন, যে তাঁর অন্তিম বাসনা জানিয়ে যান—মৃত্যুর পর যেন তাঁকে এইখানে কবর দেওয়া হয়।

গল্প শুনতে শুনতে শ্রীনগরের দিকে চললাম। এ যেন দেখার থেকে গল্প শোনার পালা বেশী। আমরা ত বলার কিছু খুঁজে পাইনা, আর সবাই যেন আমাদের গল্প শোনাবার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসেছে। যাক তাতে আর আপত্তির কি থাকতে পারে। মন্দও লাগে না, কিন্তু এক এক সময় সত্যি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। আমাদের ট্রাম, বাস আর ট্রেন হল রেষ্টুরেণ্টের দ্বিতীয় সংস্করণ। রাজনীতি, রণপ্রীতি, প্রেমগীতি; সব এর মধ্যে সসম্ভ্রমে স্থান পেয়েছে। গাড়ীর এমুড়োয় আলোচনা হবার কালে অপর প্রান্তের লোকও তাতে সড়ম্বরে যোগ দেয়—কেউ বলবে না, এ ভদ্ররুচিবিগর্হিত। শুনতে পাই, বিলেতের লোকেরা বাড়ীর ভেতরে এবং পিকনিক বা পার্টিতে যেমন হৈ-হুল্লোড়, হাসি-উচ্ছাসে মাতিয়ে রাখে, তেমনি রাস্তায় বেরোলে এদের দেখে মনে হয়, এরা সবাই বোবা—যে যার কাজে চলেছে উর্ধশ্বাসে। তাদের গতি আছে কিন্তু বিকৃতি নেই, তাদের প্রবৃত্তি আছে কিন্তু প্রচারের মনোবৃত্তি নেই। নিজের জ্ঞানসম্ভার বিস্তারের চেয়ে জ্ঞান আহরণে তৎপর। এরা বড়জোর বলে—আজ আকাশটা কি মেঘলা, বৃষ্টিটা আবার এল, ব্যাস—এই পর্যন্ত। এডওয়ার্ড দি এইটথ্ যেদিন তার পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্য একজন সামান্য নারীর বিনিময়ে ত্যাগ করলেন, সেদিনও বিলেতের পথচারীদের মধ্যে কোন উত্তেজনা বা আলোড়ন বোঝা যায় নি। মহাসংকটের দিনে মুমূর্ষু ইংলণ্ডকে যে পুনর্জীবন দিয়েছিল, সেই চার্চিল সাহেব যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পরাজিত হল, কিন্তু রাস্তার লোকের মুখে তুবড়ি ছুটিয়ে এ পরিবর্তনের চিহ্ন সূচিত হয়নি।

ফিরে এলাম আস্তানায়। টাকার থলিটা বেশ হাল্কা হয়ে এসেছে। মহম্মদের হিসেবপত্তর মিটিয়ে দিয়ে কাল এম. ই. এস -এর বন্ধুদের আড্ডায় আশ্রয় নেব।

*　　*　　*　　*　　*

মহম্মদকে খুশী করে বিদায় নিলাম। সে আমাদের কাছ থেকে একটা প্রশংসাপত্র লিখিয়ে নিল; এদের রীতিই এই। যে ওদের আশ্রয়ে থাকে, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই একটা করে প্রশংসাপত্র নিয়ে রাখে। এগুলো নতুন যাত্রী আকর্ষণ করবার কাজে লাগায়। কেউ গেলেই প্রশংসাপত্রের বাণ্ডিলটা তুলে ধরে। সবারই যখন এক ঝুড়ি করে প্রশংসাপত্র আছে তখন এ নিরর্থক বলে মনে হয়। যে অতি অভদ্র, সেও প্রশংসাপত্রের গাদা দিয়ে প্রমাণ করতে পারে, সে অতি সজ্জন এবং ভোগা দিয়ে অনায়াসে নতুন যাত্রী গাঁথতে পারে। এ যেন সরকারী চাকরীতে গুড্‌ মরাল ক্যারেকটার সার্টিফিকেট—অতি বড় লম্পটেরও এই সার্টিফিকেটের অভাবে চাকরী হয়নি এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় নেই।

এই প্রসংগে মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে পড়ে গেল। তখন মহাকবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি ভারতজোড়া। বিলেত থেকে সন্ত পাশ করে এসেছেন ব্যারিষ্টারী; কিন্তু প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হল না, কারণ ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। তাঁর মত বিখ্যাত মহাকবিকেও লোকের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল, বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পত্রের বা সুপারিশের জন্যে নয়, নিছক ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটের জন্যে।

এম ই. এস.-এর আড্ডা সহরের অপর প্রান্তে, টাঙায় করে গিয়ে পৌছলাম। হৈ হৈ করে কাটল কিছুক্ষণ। তারপর তাঁরা অফিসে বেরিয়ে গেলেন, আমরাও সামান্য বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লাম এলোমেলো ঘুরতে।

কাছেই নতুন রাজপ্রাসাদ। আগে এখানে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত, বর্ত্তমানে তার কোন আশা নেই। কাছাকাছি বাড়ীগুলো সরকারী অফিসারদের। রাস্তাটা সযত্নরক্ষিত। বিশেষ কোন দোকানপাট বা ছন্নছাড়া দারিদ্র্য চিহ্নযুক্ত কোন বাড়ী হাড়-পাঁজরা বের করে নাই। পাশেই দেখলাম নেমপ্লেটমারা, এফেন্দির প্রাসাদ—এখানে তখন 'উনো'র ডালভি থাকতেন, কিছুদিন পরে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, কাশ্মীর সরকারের ধনদৌলত পাকিস্থানে সরিয়ে। এই ঝকঝকে তকতকে পল্লীটা যে রুজ-লিপ্‌ষ্টিকে চাকচিক্যময়ী আধুনিকার ফোঁপরা তমুলতা, তা একটু ভেতর দিকে গেলেই বোঝা যায়। সেখানে কাশ্মীরবাসীর প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে, রাস্তাগুলো নোংরা, লোকগুলো ততোধিক নোংরা। পরনে কৌপীন, গায়ে বেঢপ জামা, মাথায় একটা টুপী; আর মেয়েরা পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আলখেল্লা পেলেই সন্তুষ্ট। ঠাণ্ডা লাগলে একটা লুই সর্বাংগে জড়িয়ে নেয়। লুই হচ্ছে আমাদের কম্বলের মত জিনিষ। এরা বোধ-হয় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একখানা লুই আশ্রয় করে কাটিয়ে দিতে পারে। এইগুলো ঘুরে বেড়াবার সময় চাদরের কাজ দেয়, বসবার সময় আসন, রাত্রে লেপ, আবার প্রয়োজন হলে রেশন-ব্যাগে রূপান্তরিত হয়।

কাশ্মারীদের ছোটবেলায় মন্দ দেখায় না। কিন্তু বড় হলেই গালগুলো চড়িয়ে যায়। এদের মধ্যে যারা দাড়ি রাখে, লম্বায় একটু বড় হলে অনেকটা আফ্রিদিদের মত দেখায়। খাইবার পাশের মত রুক্ষ আবহাওয়া এখানে নয়, তবুও বুঝি না কেন এদের আকৃতিতে কোন কমনীয়তা নেই।

কাশ্মীর সুন্দরের রাণী, রূপসাগরের আলো। সেখানকার সবাই হল অনিন্দিতা, অপ্সরী। ভ্রমণকারীরা গদ গদ ভাষে বলেছেন—আহা মরি, কী রূপ! টানা টানা চোখ, বাঁশীর মত নাক, পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, গালের সোনালী আভা, তার ওপর দুধে-আলতা গায়ের রঙ, নধর কান্তি, পরম....। এইখানেই থাক—আমিও ত রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।

ম্যাক্‌বেথ ভাল বলতেই হবে, যেহেতু সেটা সেক্‌স্‌পীয়রের লেখা—সে

বুঝি আর না বুঝি, ভাল লাগুক আর নাই লাগুক—তা না হলে সোসাইটীতে একঘরে হতে হবে—সবার ছি-ছির পাত্র। আসরে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভয়ংকরী খাম্বাজ রাগিনী বা কর্ণপটাহ বিদারক ডম্বুর নিনাদ শুনে তোমাকে বাহবা দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে, তা বাইরে এসে যতই না 'বাবা বাঁচলাম' বল। কলাপ্রদর্শনীতে গিয়ে একটা আঁচড়কেও তোমায় তারিফ করতে হবে, কারণ রাজ্যপাল তার প্রতিভায় পঞ্চমুখ। এরই নাম এটিকেট, ক্ল্যাসিক, সমঝদার; এরই নাম অ্যারিষ্টক্রেসী।

কাশ্মীরীদের দু-চার জনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। হয়ত তারা পর্দানশীন বলে প্রচার কার্যের সুবিধা হয়েছে। তবে সাধারণ কাশ্মীরী অতি সাধারণ—মুখের লালিত্য নেই, বুকের সৌন্দর্য নেই, অতি দরিদ্র, অতি নোংরা। তাদের স্বাভাবিক গায়ের রঙ দেখার সৌভাগ্য বোধহয় কারও হয় না। তবে এই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হবার অন্য কোন কারণ অনুমান হয়।

শোনা যায়, কাশ্মীর এমনই একটা জায়গা, যে অতিবড় চরিত্রবানও প্রলোভন প্রতিরোধ করতে পারে না। হাউসবোটে গিয়ে 'ভাল জিনিষ-পত্তর এদিকে পাওয়া যায় ত?' জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া যাবে, 'নিশ্চয়, রোজ নতুন নতুন এনে দেব'। কেউ যেন ভুল না করেন, এরা সাধারণ গৃহস্থের বউ-ঝি—এরা পতিতা। এ মহারতন সর্ব দেশের, সর্ব কালের। ইন্দ্রসভায়ও এরা সগর্বে বিরাজ করতেন। এমন কি বর্তমানেও এক পাউণ্ড সম্বলে নাকি লণ্ডনের পিকাডেলীতে সন্ধ্যায় ক্ষীণাংগীর সাহচর্য পাওয়া যায়। কোলকাতার ধর্মতলা তত্ত্বকথায় ভরা—দেহতত্ব আর সমাজতত্বের নগ্ন উপকরণে পরিপূর্ণ।

এখানকার পতিতারা সবাই যে কাশ্মীরী তা নয়, বাইরে থেকেও বহু আমদানী করা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে হাউসবোটের রক্ষকের মেয়েরা এই পাপ-ব্যবসায় লিপ্ত হয়। কাশ্মীর আসার আগে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছিলাম, রাত্রে হাউসবোটগুলো নাকি কন্দর্পের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত

হয়; আর ফরাসী দেশ সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে, সেখানে স্ত্রী সংগে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া আর নিউক্যাসেলে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া একই কথা, সে কথা নাকি কাশ্মীরের পক্ষেও প্রযোজ্য। এর কিছুটা কল্পনা, কিছুটা অতিরঞ্জন। তবে উদ্যম ও উৎসাহ থাকলে উপায়ের অভাব হয় না। একটা কথা মনে হয়, এখানকার এই সহজলভ্যতাই কি কাশ্মীরকে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ দেশে রূপান্তরিত করেছে?

ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে এসে পড়েছি। আরে? সেই কৃষিবিভাগের অফিসার না? কাশ্মীর আসার পথে যাঁর সংগে আলাপ হয়। যাঁকে গানের ককটেল শুনিয়ে বাঙালী গাইয়ে জাত, এই কথার মর্যাদা রক্ষার নামে অমর্যাদা করেছিলাম? হ্যাঁ, তিনিই।

নিজস্ব পরিবেশে, পদমর্যাদায় পুষ্ট হয়ে পথের সাথীকে পরিবর্জন করাই বোধহয় সাধারণ নীতি, কিন্তু যেহেতু সখ মেটাতে কাশ্মীর বেড়াতে গেছি, নিশ্চয় কেউ-কেটা হব ভেবে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। তিনি বৈকালীন ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, সংগে আর একজন বন্ধু।

তিনি বলেন—কেমন দেখলেন? কেমন লাগল? এখানকার লোকগুলো কেমন? ইত্যাদি।

তাঁর বন্ধুর সংগেও পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনিও সরকারী অফিসার—বোটানিষ্ট। তারপর সবাই মিলে ডাল লেকের ধারে গিয়ে বসলাম।

নানান কথা হতে হতে মোগল উদ্যানের কথা উঠলো—শালিমার, নিশাদবাগ, চশমাশাই। নতুন ভদ্রলোকটী একে একে সুরু করেন—এই যে মোগল উদ্যানগুলো দেখেছেন, এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য কী?

—বৈশিষ্ট্য এর ফুলের বাগান, স্তরে স্তরে নেমে গেছে, ফুলের ভারে নুয়ে পড়েছে গাছগুলো, মাঝেখানে ঝর্ণা, চারিদিকে ফোয়ারার জলকেলি—কী আবেশমাখা পরিবেশ!

তিনি বলেন—যা দেখেছেন, তা ছাড়া আরও অনেক কিছু দেখবার আছে,

জানবারও আছে। এই উদ্যানগুলো সেকালের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিচায়ক। চতুষ্কোন বাগান। চারিদিক পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—তার ভেতর থেকে কামান দাগা যায়, এমন বহু ছিদ্র আছে। বিরাট সিংহদ্বার, লৌহশলাকা দিয়ে তা আরও সুরক্ষিত করা। তখনকার দিনে রাজ্যের অবস্থা শংকাশূন্য ছিল না ; উঁচু উঁচু প্রাচীর দেওয়া হত, যাতে কোন দুর্বৃত্তের দল এসে বাদশাজাদাদের হঠাৎ আক্রমণ করতে না পারে। আর আছে উচ্ছল জলপ্রবাহ—সৌন্দর্যের পরম প্রতীক। বাদশারা তাঁদের প্রেয়সীকুল নিয়ে আসতেন এই স্নিগ্ধ শীতল আবহাওয়ায় ; ডুবে যেতেন গভীর প্রণয়-বিলাসে—বিভোর হয়ে যেতেন দ্রাক্ষালতার রসে—ভেসে চলতেন স্বপ্ন রঙীন কল্পলোকে—সুরা ও সাকীর মাঝে ভুলে যেতেন শাসনের কূটচক্র।

মনের মাঝে আজও ফুটে ওঠে ছবি—শ্যামলিমায় ঘেরা স্নিগ্ধ মধুর কুঞ্জবন, সোনার বরণ ঘাসে ঢাকা মাঠ, জলোচ্ছাসে ঝলমলিয়ে ওঠে চাঁদের সোনালী কিরণ, ভেসে আসে গুলবাগিচার সুবাস। বাহুডোরে বাঁধা সুন্দরী ক্ষীণকটী তরুণী ; ঝর্ণার উচ্ছল জলস্রোত কলশব্দে চলেছে সামনের দিকে, আর তা থেকে উড়ে আসছে বিন্দু বিন্দু শীতল জলকণা ; জলের তলায় নীল টালি দিয়ে মোড়া, যেন আকাশের নীলিমা নেমে এসেছে জলে। এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে নেমে চলেছে 'চাদর'-এর ওপর দিয়ে। জলপ্রবাহের ঢালু জায়গাটা শ্বেতপাথর দিয়ে মোড়া, তার গায়ে রকমারি খাঁজকাটা ; জলধারা পাথরের সেই খাঁজের ওপর বাধা পেয়ে নানা তরংগ-ভংগে চারিদিকে বিচ্ছুরিত হয়। তার সৌন্দর্য কাশ্মীরী শালের অভূতপূর্ব কারুকার্য থেকেও সুন্দর, তাই ত এর নাম চাদর।

মোগল উদ্যানের এই জলপ্রবাহই তার বিশেষ আকর্ষণ। বাদশারা ঝর্ণা দেখে বেছে নিতেন তাঁদের বিরাম-কুঞ্জের স্থান। ধাপে ধাপে তাকে প্রশস্ত করা হয়েছে। সমতল ভূমিতেও কৃত্রিম উপায়ে ঝর্ণার সৃষ্টি করা হয়েছে। সামান্য দু-ফিট উচ্চতাকে কাজে লাগিয়েছে—বাঁধনহারা জলধারাকে রূপ দিয়েছে কী অপরূপ স্বচ্ছন্দগতি ঝর্ণায়! জলবিকিরণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভিলিয়ার্ন

ষ্টুয়ার্ট (Villiers Stuart) বলে গেছেন—**The spirit of the garden-paradises of Europe hides in the flowers, the grass, the trees, but the soul of Eastern garden lies in none of these; it is in running water which alone makes its beauties possible.**

সম্ভবতঃ মোগলরা পার্বত্য দেশ থেকে এসেছিলেন বলে ধাপে ধাপে উদ্যান গড়ার পরিকল্পনা তাঁদের ছিল। এমন কি লাহোরের সমতল ভূমিতেও ধাপে ধাপে বিভক্ত শালিমার উদ্যান গড়েছে। কারও কারও মতে, মুসলমান শাস্ত্র অনুশাসনে স্বর্গ আট ভাগে বিভক্ত, তাই তারা আটতলা উদ্যান সৃষ্টি করেছে; সাততলা করছে সপ্তগ্রহ অনুকরণে; দ্বাদশ রাশিচক্র স্মরণে জাহাংগীরের মন্ত্রী আসিফ খান গড়েন দ্বাদশতল নিশাদবাগ। ১

প্রণয়-নিকুঞ্জ বা এই প্রমোদ-উদ্যান রচনার পরিকল্পনা ভারতের নয়, এসেছে পারস্য দেশ থেকে। ভারতের হিন্দু-সংস্কৃতির আদর্শ ছিল ত্যাগের, আত্মদানের; আর মুসলমানের আদর্শ ভোগের, জীবন-মাধুর্য-আহরণের। হিন্দুরা করেছে পূজা-অর্চনা, কঠোর সাধনা, নিস্বার্থ সেবা; মুসলমানরা দেখিয়েছে আভিজাত্য, আড়ম্বর, উপভোগ। হিন্দুরা গড়েছে মঠ, মুসলমানরা গড়েছে প্রমোদ-উদ্যান! হিন্দুরা বনমহোৎসব করেছে, কারণ সে রোগে দেবে ওষধি, ক্ষুধিতে দেবে ফল, যজ্ঞ-সমিধ রচনায় দেবে কাঠ। তাই রূপ দিয়েছে পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্যের। তাই তারা মধুমঞ্জরিত, ভ্রমরগুঞ্জরিত পুষ্পোদ্যানের কথা ভাবেনি—তাদের পরম উপভোগ যে লোকান্তরে।

মুসলমানের ধারণা জীবনটা ভোগের, আনন্দের, শিল্পের। তাদের স্বর্গ তারা নিজেরাই গড়ল পুষ্পোদ্যানে:—

অগর ফিরদাস বাররুয়ে জামিনাস্ত্,
হামিনাস্তো, হামিনাস্তো, হামিনাস্তো।

পারস্য কবি ওমর খৈয়ামও তাঁর অন্তিম বাসনা জানিয়ে গিয়েছিলেন, ‘আমার কবর এখন একটী জায়গায় বিরচিত হবে যেখানে কুসুমিত তরুশাখা হতে বর্ষে বর্ষে আমার সমাধির ওপর পুষ্পাঞ্জলি বর্ষিত হবে’ ।

পুষ্পোদ্যান সৃষ্টির পরিকল্পনা পারস্যের। সেখানে পার্বত্য ঝর্ণা আর নদী প্রবাহিত। তার ধারে ধারে গড়ে উঠেছে পুষ্পলতার কুঞ্জবন। আজও পারস্যের দীনতম কুটীরেরও আঙিনায় ফুলের বাগান আছে। কিছু না হয়, কয়েকটা গোলাপের চারা থাকবেই। কোথাও বা লবংগলতিকার কুঞ্জ। অবসর সময়ে গৃহস্থরা সেখানে বসে বিশ্রাম করে; বন্ধু-বান্ধব এলে চায়ের আসর জমায়; মেয়েরা পাড়ার মুখরোচক সমালোচনা করে। যারা বড় গৃহস্থ, তাদের উদ্যান বৃহত্তর; মধ্যে জলাশয়, তাতে বিকশিত কমলদল আর চতুর্দিকে বিছান নানা বৈচিত্র্যময় পুষ্পসম্ভার—গোলাপ, ড্যাফোডিল, গাঁদা, ভায়োলেট, পপি।

সাইপ্রাস গাছ এদের খুব প্রিয়। তাছাড়া ঝাউ গাছ, বিষাদমগ্ন উইলো গাছ ত আছেই। মোগল বাদশাদের মহিষীরাও ভারতে পুষ্পোদ্যান বিস্তারের গৌরব দাবী করতে পারেন। বাবরের পত্নী বাগ-ই-ওয়াফা, বাগ-ই-কিলান এবং আগ্রায় যমুনার তীরে রামবাগ গড়বার জন্যে সম্রাটকে অনুপ্রাণিত করেন। কাশ্মীরের বিখ্যাত উদ্যান নিশাদবাগ, শালিমারবাগ, আচ্ছাবল এবং ভেরীনাগ উদ্যান তৈরী হয়, সম্রাট জাহাংগীর এবং বেগম নূরজাহানের যৌথ প্রচেষ্টায়। শালিমার বাগের পরিকল্পনা আলি মর্দান খানের, যিনি সাজাহানের অমর শিল্পী —তাজমহলের স্রষ্টা। যে চানার গাছ আজ কাশ্মীরের জীবন, সেই চানার গাছ কাশ্মীরে রোপন করেন আলি মর্দান খান।

আরও মজার কথা, এখানকার উদ্যান সজ্জার পেছনে আছে আদর্শ, আছে জীবন-দর্শন, আছে বিরহ-মিলনের উপাখ্যান :

মোগল বাদশারা সাইপ্রাস আর শ্বেতপুষ্প বিশিষ্ট কমলা ও অন্যান্য নেবু গাছ একই জায়গায় রোপন করতেন। যেমন জীবনের মধ্যে পাশাপাশি থাকে

আশা আর আশংকা। এখানকার উদ্যানের মাঝে দেখেছেন, সাইপ্রাস থাকে আর থাকে আপেল ডালিম ও বাদাম গাছ। শেষের কটি হল জীবন, যৌবন ও আশার প্রতীক। সামনের আপেল ডালিম আর বাদাম গাছের শুভ্র পুষ্পসম্ভারে সূচিত হচ্ছে আশার বাণী—তারা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে জীবন-যৌবনের কথা। আর ঘন সবুজ সাইপ্রাস গাছ হল মৃত্যু—সবার পশ্চাৎ থেকে যেন জানিয়ে দিচ্ছে আমি পরিণতি, আমি নিশ্চিত, আমি চিরন্তন। এক একটী উদ্যান মানুষের জীবন প্রবাহের একটা সুন্দর প্রতিচ্ছবি।

কাশ্মীরের উদ্যান আরও স্মরণ করিয়ে দেয় লায়লা আর মজনুর কথা। লায়লা আর মজনু, দুটী ছোট ছেলে আর মেয়ে। তারা জানে না, পরস্পর পরস্পরকে কবে ভালবেসেছিল, এ যেন কোন নির্দিষ্ট সময়ের সীমারেখার মধ্যে নিবদ্ধ নয়, এ যেন অনন্তকালের—একই সূত্রে গাঁথা দুটী প্রাণ। বড় হল দুজনে। নবযৌবন ভারে লায়লা হল অপরূপ সুন্দরী—জীবন-যৌবন যেন উছলিত হয়ে ওঠে। মজনু যুবক—সুন্দর, মোহময়, অপরূপ। তাদের ভালবাসা গভীর হতে গভীরতর হল—আবার নতুন করে অন্তরে অন্তরে হল প্রাণ দেওয়া-নেওয়া। কিন্তু রূঢ় জগৎ ; স্বামী সমভিব্যাহারে লায়লাকে যেতে হল শ্বশুরালয়ে। বিষাদে, আত্মপীড়নে, মজনু প্রাণ হারাল ; লায়লাও তার অনুগমন করল—তারা যে পরস্পর প্রাণের সাথী। তবুও আশা, যদি পরজন্ম থাকে !

দেখে থাকবেন হয়ত, সমজাতীয় দুটী করে ছোট গাছ কাছাকাছি লাগান হয়েছে। তারা পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে, কোথাও বা একটী স্ত্রী সাইপ্রাসের পাশে একটী পুরুষ সাইপ্রাস। একজন লায়লা অপর জন মজনু। স্বর্গরাজ্যে তারা নিশ্চয় সুখী।

বিষাদসিন্ধু মজনু আজও দাঁড়িয়ে আছে উইলো গাছ হয়ে (বইদ-ই-মজনু) আর তারই সামনের জলাশয়ে পদ্ম হয়ে ফুটে আছে লায়লা, কিন্তু দুজনে পরস্পরের নাগালের বাইরে।

ফেরার পথে কেবলই মনে পড়ছিল লায়লা আর মজনুর কথা, মোগল উদ্যানের এক ভিন্নরূপ খুলে গেল আমাদের সামনে।

*　　*　　*　　*

সেদিন শংকরাচার্যের মন্দির। বেশ আরাম করে ঘুমচ্ছিলাম। একি! কে যেন খাট শুদ্ধ তুলে নিয়ে যচ্ছে আমাকে···দেখি, ডাকতে সুরু করেছে— শংকরাচার্যের পাহাড়ে যেতে চাস্ ত ওঠ., বেলা হয়ে গেল।

—বেলা হয়ে গেল কিরে? এখন ত আদ্দেক রাত।

—আদ্দেক টাদ্দেক বুঝি না, সবাই উঠে পড়েছে, যাবি ত সাজ-গোজ করে নে।

তথাস্তু বলে পাশ ফিরে শুলাম, বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁচকা টানে চড়াক করে ঘুম ভেঙে গেল। এই বোধহয় লাষ্ট ওয়ার্নিং। না উঠলে যাওয়া হবে না। নাঃ, এই ভোর বেলার মজলিশি ঘুমটা বোধহয় ওদের গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি উঠে চোগা-চাপকান গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম, আমার রাগটা খুব অহেতুক নয়, কারণ বেলা হওয়া ত দূরের কথা, জলজ্যান্ত চাঁদের আলো বর্তমান।

মন্দিরটা তখৎ-ই-সুলেমন পাহাড়ের মাথায়। শ্রীনগরের উচ্চতা থেকে প্রায় হাজার ফিট বেশী হবে। পাহাড়ে ওঠার নির্দিষ্ট পথ একটা আছে, তবে নেড়া পাহাড় বলে মানুষ পায়ে হেঁটে সর্টকাট অনেক রাস্তা তৈরী করেছে, তার যে কোনটা দিয়েই ওঠা যায়। আমাদের আস্তানা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে আধ মাইলটাক হবে। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে প্রায় ডজনখানেক বাঙালী যুবক চলেছি, মন্দ লাগছে না এখন।

পাহাড়টা দেখে ভেবেছিলাম, ভারী এইটুকু ত, এক ছুটেই মেরে দেব। ভাবাটা যত সোজা, পাহাড়ে ওঠা ঠিক ততটা সহজসাধ্য নয়।

তবে সূর্য ওঠার অনেক আগেই শংকরাচার্যের আশ্রয়ে এসে পড়লাম। প্রকাণ্ড মন্দির, তার দ্বারে পৌঁছতে গেলেও যেন তখৎ-ই-সুলেমানের মত আর একটা পাহাড় প্রমাণ সিঁড়ি ভাঙতে হয়। মন্দিরের মধ্যেও তদনুরূপ শিবলিংগ; সামনে প্রদীপ জ্বলছে। মন্দিরের চতুর্দিকে বিস্তৃত বারান্দা। সেখান থেকে সমগ্র শ্রীনগরটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঝিলামের স্রোতখানি যে বাঁকা, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখানে না এলে বোঝা যায় না—সর্পিল ভংগিমায় এগিয়ে গেছে। বিস্তৃত ডালহ্রদ, তার বুকে সারিবন্দী নৌকাগৃহ, শিকারা আর বিন্দু বিন্দু ভাসমান উদ্যান। এক প্রান্তে দেখা যাচ্ছে নবতম রাজপ্রাসাদ, বাড়ী-ঘরগুলো যেন মনে হচ্ছে ছোট্ট খেলাঘর।

ঘুরে ফিরে এলাম। সেখানে আর এক ভদ্রলোককে দেখে আলাপ জুড়ে দিলাম। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন; তাও শুনলাম, প্রত্যেকদিন ভোরে এখানে বেড়াতে আসেন। ধৈর্য আর সামর্থ্য আছে ভদ্রলোকের। ব্যক্তিগত ছেড়ে এবার স্থানগত কথা উঠল।

তিনি বলেন—এই মন্দির নির্মাণ করেন সন্দিমন খৃঃ পূঃ ২৬২৯ থেকে ২৬৬৪ অব্দের মধ্যে। পরে ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির সংস্কার করেন গোপাদিত্য খৃঃ পূঃ ৪২৬—৩৬৫ অব্দে এবং পুনঃসংস্কার করেন ললিতাদিত্য ৬৯৯—৭৩৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অনেকের মতে, সন্দিমনের নির্মিত আদি মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছিল। রাজা গোপাদিত্য সেখানে নতুন করে মন্দির স্থাপনা করেন।

বলি—আপনি কি ইতিহাসের অধ্যাপক নাকি? আশ্চর্যের কথা, খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নখদর্পনে!

বললেন—ঠিক ধরেছেন। তাছাড়া কাশ্মীরের ইতিহাস সম্বন্ধেও আমি গবেষণা করছি।

আর ছাড়ছি না তাঁকে, গেড়ে বসলাম সেখানে।

তিনি বলেন—এখানে আর কত বলব? বরং আমার বাড়ীতে আপনাদের চায়ের নিমন্ত্রণ রইল, সেই সংগে গল্পও শুনে আসবেন।

—পরের কথা পরে হবে। বর্তমানে সামান্য যাহোক কিছু ত বলুন? আমায় নাছোড়বান্দা দেখে শেষে সুরু করেন—কাশ্মীর ভারতের অংশ-বিশেষ কিন্তু ভারতের ইতিহাসে তার কোন রেকগ্‌নিশন নেই। অথচ কাশ্মীরীরা প্রাচীন সুসভ্য জাত। এদের সংস্কৃতি, এদের সভ্যতা, এদের বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য বিস্তার করেছে ভারতবর্ষে। পিরপাঞ্চাল পর্বতশ্রেণী দিয়ে ঘেরা এই দেশকে, কি জানি কেন, ভারতীয় ঐতিহাসিকবৃন্দ এমন অবহেলার চোখে দেখেছেন। সংস্কৃত ভাষায় কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা আছে। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরংগিণীতে সুপ্রাচীন কাল থেকে ১১৪৮ খৃঃ পর্যন্ত ইতিহাস আছে। তারপর ভারা পণ্ডিতের 'জৈনরাজ তরংগিণী' ও রাজভট্টের 'রাজাবলী পিটক'-এ আকবরের কাশ্মীর বিজয় কাল পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

সেই আদিম যুগে দেশ ছিল প্রায় জলমগ্ন। দৈত্যরা বাস করত সেখানে। তারা নাকি সুন্দরী রমণীর রূপ ধরে জলার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে থাকত, যেমন রাইন নদীর তীরে বসে থাকত কুহকিনী লোরলে—যেন স্বর্ণকেশী কেশ-বিন্যাসে ব্যস্ত, মুখে স্নিগ্ধ ভাব। জেলেরা নদীর তীর ধরে চলতে চলতে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। তেমনি রূপবতী সেজে কাশ্মীরের জলকন্যারা আকৃষ্ট করত আগন্তুকদের, তারপর যখন পথিকরা মুগ্ধ হয়ে রূপসীর আশ্রয়ে আসত, তারা স্বরূপ ধরে হত্যা করত পথচারীদের।

এদিকে মারিচির পুত্র কাশ্যপ মুনির বাসনা হল, আর এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনার। হাজার হোক ব্রম্হার নাতি, সৃষ্টিতত্ত্বে তাঁর বংশগত অধিকার। দল গড়লেন স্বর্গরাজ্যে, তাঁদের প্রোগ্রাম ডেস্‌ট্রাকটিভ নয়, কন্‌সট্রাকটিভ। নজর পড়ল এই পোড়ো জলাভূমির ওপর। দৈত্যদের পরাজিত করলেন, তারপর তপস্যা বলে সৃষ্টি করলেন স্থলভাগ। চিপহুইপের নাম অনুসারে দেশের নাম হল কাশ্মীর। নাগকুলই হল তাঁর প্রজার বৃহত্তম অংশ।

প্রজারা প্রজাই থাকে, রাজা হবার মত দুঃসাহস তাদের নেই। রবীন্দ্রনাথও

বলে গেছেন, জনসাধারণ হল প্রদীপের পিলসুজ, তারা সভ্যতার আলো তুলে ধরে, তবে তাদের প্রাপ্য হল গড়ান রেড়ীর তেলটুকু। তাই যখন কাশ্মীর রাজশূন্য হল, নাগকুল অসহায় হয়ে বিশ্বমন্থন সুরু করল রাজার সন্ধানে এবং শেষ পর্যন্ত নীলমুনিকে আহ্বান করে আনল রাজসিংহাসন অলংকৃত করার জন্যে। নাগচর্ম দিয়ে নতুন করে তৈরী হল রাজছত্র—তাদের মনিরত্ন দিয়ে গড়ে তুলল এক ঐশ্বর্যশালী নগর। কুবেরের ধনভাণ্ডারকে অতিক্রম করল কাশ্মীরের বৈভব। সেখানে পুরাকাহিনীর ইতি।

আবার ইতিবৃত্ত পাই কলিযুগে, ছত্রপতি গোনাণ্ডার শাসনকালে। সে হল কলিযুগের ৬৫৩ অব্দে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে। ভূস্বর্গের গোনাণ্ডা ইন্দ্রপ্রস্থের যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন—কিন্তু তাঁর মিত্র ছিল 'চক্রশক্তির' জরাসিন্ধু।

জরাসিন্ধু চাইলেন শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী অবরোধ করতে। দুই বন্ধুতে মিলে দ্বারকায় উপস্থিত হলেন। সিন্ধুর তীর সৈন্যের তূর্যনাদে প্রকম্পিত করে জানিয়ে দিলেন—সহজে নিস্তার নেই। পরাজিত হল কৃষ্ণসৈন্য, তখন কৃষ্ণসখা বলরাম সুরু করলেন প্রতিআক্রমন। বহুদিন ধরে যুদ্ধ চলল। বলা যায় না, কে হারে কে জেতে? হঠাৎ শরবিদ্ধ হয়ে গোনাণ্ডা প্রাণ হারালেন যুদ্ধক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণের বিজয়লক্ষ্মী হল সুপ্রসন্ন।

তারপর দামোদর হলেন কাশ্মীরের রাজা। রত্নময় রাজ্য পেলেন বটে তবে প্রাণরত্ন পদদলিত—পিতার পরাজয়ের গ্লানি বীর পুত্রকে বিদ্ধকরে প্রতিনিয়ত, এ পরাজয়ের প্রতিশোধ না নিতে পারলে শান্তি নেই মনে। প্রতীক্ষারত চাতক, সুযোগের সন্ধানে ঘুরতে লাগল।

গান্ধারকুল শ্রীকৃষ্ণকে সদলবলে আহ্বান করলেন এক বিবাহবাসরে। গান্ধার কুমারীবৃন্দ আসর সাজাবে—বসাবে রূপযৌবনের মেলা। বরসাজে সেজে কৃষ্ণের দল এসে বেছে নেবে পছন্দমত বধূ। সিন্ধুর তীরে বসাল বিবাহ বাসর। সাড়ম্বরে বিঘোষিত হল উৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী····· বাদ সাধলেন দামোদর, সৈন্যসামন্ত নিয়ে হাজির হলেন সেখানে—বিবাহবাসর পরিণত হল মহাসমরে।

কৃষ্ণসখা প্রাণহারাল অনেকে। হায়! কোথায় উপভোগ করবে নব-বধূর মিলন-মাধুর্য তা নয়, হাড়ে হাড়ে বুঝছিল প্রজাপতি ঋষির সংহার ছন্দ।

ভোলানাথ শিবের ভিন্নরূপ হল রুদ্র। রাধাবিনোদন কৃষ্ণের চক্রে দামোদরের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল।

অন্তঃসত্বা রাণী যশোবতী বিধবা হলেন, তবে তাঁর বৈধব্য বিভবকে স্পর্শ করল না। রাজ্ঞী ছিলেন; কৃষ্ণানুগ্রহে হলেন শাসনকর্ত্রী—সর্বময় ক্ষমতার অধিকার। মন্ত্রীরা রুখে দাঁড়াল—সেকি? একজন সামান্য নারী হবে তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা? লজ্জায় জগতের সামনে যে তারা মুখ দেখাতে পারবে না!

আবার শ্রীকৃষ্ণকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হল, অবশ্য অসি বা মসী কোনটাতেই নয়, স্রেফ বাকযুদ্ধে—শব্দ-ব্রম্হা থাকতে আর কার পরোয়া। পুরাণকে প্রামান্য খাড়া করলেন। বললেন—জান কাশ্মীরের সম্রাট হলেন মহাদেব, আর কাশ্মীরের মহিষীরা সামান্য নন—পার্বতী। পৃথিবীর সংস্পর্শে এসে তাঁদের মধ্যে জাগতিক মনোবৃত্তি সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে, তবুও তাঁরা হরপার্বতী। মানুষ যে নারীকে উপভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করে, ইনি তাদের সমগোত্র নন—ইনি প্রজাপালক—ইনি দেবী—জগৎজননী।

তর্কে পরাজিত। সুদর্শন চক্রের ভয়াবহ মহিমা তখনও অন্তরে জাগরুক। তাই মাথা নিচু করে বলতে হল—তথাস্তু। পার্বতী—দেবী……তবুও নারী-শাসন!

যথাসময়ে রাণীর পুত্র-সন্তান হল। আবার সাড়া পড়ে গেল রাজ্যে—নারী-শাসনের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ব্রাম্হণরা সাড়ম্বরে জন্মোৎসব ও রাজ্যাভিষেক একই সংগে সারল। পিতামহের নাম অনুসারে নাম দেওয়া হল গোনাণ্ডা। সদ্যজাত শিশুকে বসাল রাজসিংহাসনে এবং তারই নামে প্রতিষ্ঠা করল ন্যায়নিষ্ঠ (?) বিচার। যার দিকে চেয়ে এই বালক হেসে উঠত, তাকে দেওয়া হত ধনসম্পদ। পরিষদ যখন তার আধ

আধ কথার অর্থ উদ্ধার করতে পারত না, নিজেদের অক্ষমতায় লজ্জিত হয়ে পড়ত। সেই সময় প্রলয়ংকর কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়। শিশু রাজা কোন পক্ষ অবলম্বন করেনি।

দশম রাজা হলেন অশোক, শকুনীমামার প্রপৌত্র। তিনি নিষ্পাপ ও মহানুভব রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ঝিলামের ধারে ধারে বহু বৌদ্ধস্তূপ নির্মাণ করেন। তিনি এই শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজত্বকালে শ্রীনগরে সুসজ্জিত অট্টালিকার সংখ্যা ছিল প্রায় এককোটী।

দুর্বলতা বোধহয় মহানুভবতার সহগামী। ম্লেচ্ছরা (Scythians) এসে তাদের বিজয়কেতন ওড়াল কাশ্মীরে। রাজ্যচ্যুত হয়ে মহারাজ দেব সাধনায় মন দিলেন। তপস্যায় প্রীত হলেন মহাদেব। দেবানুগ্রহে তিনি লাভ করলেন বীরপুত্র জলৌককে।

জলৌক পিতৃগৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ম্লেচ্ছদের শুধু পরাজিত নয়, দেশ ছাড়া হতে বাধ্য করেন। শিব সাধনায় তিনিও অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করেন। সেই শক্তিবলে তিনি নদীগর্ভের যুবতী নাগকন্যাগণকে উপভোগ করতেন। কনৌজ জয় করে সেখান থেকে ধর্মজ্ঞ, আইনবিশারদ, শাসন ও কলাবিদ মনীষীদের নিয়ে আসেন কাশ্মীরে। দেশে ন্যায়, শাসন, ও শৃংখলা প্রবর্তন করেন। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যে প্রধান বিচারক, রাজস্বসচিব, কোষাধ্যক্ষ, প্রধান সেনাপতি, রাজদূত, কুলপুরোহিত এবং দৈবজ্ঞ নিয়োগ করেন।

রাজা জলৌক সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। একদিন তিনি বিজয়েশ্বর মন্দিরে উপাসনা করতে চলেছিলেন, পথে একটী স্ত্রীলোক জানাল, সে বড় ক্ষুধার্ত, মহারাজের কাছে খাদ্যপ্রার্থী।

রাজা তার প্রার্থনা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন—কি খেতে চাও? তখনই নারীমূর্ত্তি বিকট আকার ধারণ করে জানাল, সে নরমাংস খেতে চায়।

সমস্যা বটে! নরহত্যা করার আদেশ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

আবার প্রতিজ্ঞা ভংগ করতেও পারেন না। উপায়ান্তর না দেখে রাজা নির্বিকারভাবে নিজের দেহ থেকে মাংস দিতে উদ্যত হলেন। রাজার এই মহানুভবতা দেখে সে মুগ্ধ হয়ে উল্লাসভরে বলে উঠল—আপনি নিশ্চয় ছলনাকারী বুদ্ধ।

—বুদ্ধ! সে আবার কোন মহাপুরুষ? তাঁর সম্যক পরিচয়ও আমি জানি না; নিজে পরম শাক্ত।

তখন সেই স্ত্রীলোক ভিক্ষা চাইবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলে—কাশ্মীরের অপর প্রান্তে লোকালোক পর্বতে কৃত্তিকা নামে এক জাতি বাস করে, তারা বুদ্ধানুরাগী। ক্ষমাই তাদের ধর্ম, তারা জ্ঞান এবং সত্যের প্রচারক। কিন্তু মহারাজ তাদের আশ্রয়চ্যুত করেছেন। আমাদের আশ্রমের ঢাকের শব্দে এক রাত্রে আপনার ঘুম ভেঙে যায়। কয়েকজন দুষ্টের পরামর্শে তখন আপনি আমাদের আশ্রম ভেঙে দিলেন। ক্রুদ্ধ বৌদ্ধরা আপনাকে হত্যা করার বিধান দিয়েছেন; কিন্তু আমাদের প্রধান পুরোহিত জানিয়েছেন, যদি আপনি আমাদের মঠ পুনর্নির্মাণ করে দেন, তবে আপনার সব অপরাধ ক্ষমা করা হবে। রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন তা গড়ে দেবেন এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করেন।

বৃদ্ধ বয়সে এক শিবমন্দিরে বিরাট উৎসবের আয়োজন করেন। তিনদিন ধরে যাগ-যজ্ঞ, পূজা-উৎসব হবার পর, রাজপুরীর একশত রমণী নৃত্যগীতে ভরিয়ে দিল পূজামণ্ডপ। রাজা নৃত্যকুশলী রমণীবৃন্দকে দেবসেবায় দান করে দেবসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন।

—তাহলে দেবতাদেরও মানুষের মত সেবাদাসী লাগে?

—এ আর নতুন কি? দেবদাসীর প্রথা ত এদেশে বহুল প্রচলিত।

—আপনি দেখছি সেই মান্ধাতা আমলেই আছেন, ঐতিহাসিক যুগের মানুষ। মধ্যযুগীয় দাসী কথাটা নারী প্রগতির যুগে অভিধান থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই প্রয়োগের জন্যে আপনি মানহানির দায়ে পড়তে পারেন—

এ ত লাইবেল-পার-সি, স্বতঃ-প্রমাণিত। আজকাল ওঁরা হয়েছেন—সহধর্মী, সমকর্মী বা সাথী।

—কি করে জানব বল? আর ওটা একান্তভাবে তোমাদের পক্ষে প্রযোজ্য। আমরা ত ওল্‌ড ফুল। দাসী প্রয়োগে গৃহযুদ্ধ হবার আশংকা আমাদের আর নেই, বলে হেসে ওঠেন।

আবার সুরু করেন—কলিযুগের ২৯৯৮ অব্দে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ১০৩ অব্দে কাশ্মীরের রাজা হন তুংগিনা। দেশ শাসনে, শৃংখলারক্ষায় এবং প্রজাপালনে তিনি অদ্বিতীয়। প্রজাদের সুখ-দুঃখের চিন্তাই তাঁর জীবনের একমাত্র কর্ম ছিল—প্রজাদের মংগল সাধনই ছিল তাঁর ব্রত। এক বছর ভয়ংকর শিলাবৃষ্টি আর তুষারপাত আরম্ভ হল। পাকা শালি ধান নষ্ট হয়ে গেল। দেশে অভাব দেখা দিল। ক্রমে অবস্থা চরমে পৌছল, দেখা দিল মন্বন্তর। লজ্জা, গর্ব, আভিজাত্য মানুষের মন থেকে বিলীন হয়ে গেল। সামাজিক মানুষ হল সভ্যতাশূন্য পশু। ক্ষুধার তাড়নায় তারা হন্যে কুকুরের মত ঘুরতে লাগল। স্নেহ-প্রেমের সম্পর্ক ভুলে পরম আত্মীয়কে বঞ্চিত করেছে, কেড়ে নিয়েছে তার মুখের গ্রাস। মানুষ নেই, যেন হিংস্র কংকাল মাথা খুঁড়ছে সর্বত্র।

রাজা-রাণী ঝাঁপিয়ে পড়লেন মানুষের সেবায়; রাজকোষ, শস্যভাণ্ডার সব উন্মুক্ত করে দিলেন প্রজাদের প্রাণ রক্ষায়। অন্নসত্র খুলে দিলেন রাজপ্রাসাদে—দিবারাত্র চলল অন্নহীনে অন্নদান। সমুদ্রেরও সীমা আছে, রাজভাণ্ডার শূন্যভাণ্ড হল—এক দানাও অন্ন নেই। হায়! আর বোধহয় রক্ষা করা যায় না, প্রজাদের বাঁচাবার কোন পথ নেই। শোকসন্তপ্ত তুংগিনা মহারাণীকে বললেন—নিশ্চয় আমাদের কোন পাপের ফলে রাজ্যে এই অমংগলের সূচনা। আমার চোখের সামনে আমারই প্রজা অনাহারে শুকিয়ে মরছে আর আমি অসহায়ের মত তাই দেখছি; তাদের বাঁচাতে পারছি না! এ জীবনের কী সার্থকতা!

এতদিন রাজ্য ছিল সম্পদ ও সৌভাগ্যের, আর আজ তা গরিমা হারিয়ে

দারিদ্র্যে ডুবে গেছে। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সম্পদ, সব ভেসে গেছে। দেশ মহাসংকটে পূর্ণ—ধ্বংসের পথে নেমে চলেছে—প্রলয় তাকে গ্রাস করেছে।

দেশের বাইরে থেকে সাহায্য পাবার ক্ষীণতম আশাও নেই, গিরিপথ তুষারস্তূপে আবদ্ধ। এইখানে আমাদের সমাধি হবে! দুঃখগ্লানিতে ভরা অন্তরবেদনা অশ্রুজলে রূপান্তরিত হল। বললেন—আমি মৃত্যু চাই, মরণের চিরশীতল কোলে আশ্রয় লাভ করা ছাড়া আমার আর শান্তি নেই।

রাণী তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—দুঃখ দুর্দশায় কাতর হওয়া স্বাভাবিক, তাই বলে ধৈর্য হারালে ত চলবে না। পরাজিত হয়েছ বলে মনুষ্যত্বকে অবমাননা করা সংগত নয়। তুমি ধৈর্য ধর, দেখবে দেশবাসীর এ দুর্দশা অচিরে বিদূরিত হবে।

শেষ পর্যন্ত রাণীর আদেশে গাছের পাখী শিকার করে প্রজাদের মধ্যে বিতরণ করা হতে লাগল। এমনি ভাবে দৈন্যের সংগে মানুষের চলল কঠোর সংগ্রাম। এদিকে দেখতে দেখতে বছরও ঘুরে এল। নতুন ফসলের আশায় লোকে নতুন উদ্যম নিয়ে নেমে পড়ল। দেশের ভাগ্যলক্ষ্মীও মুখ তুলে চাইল। সোনার ফসল মাঠে ঝলমলিয়ে উঠল। ধনৈশ্বর্যে আবার ভরে উঠল দেশ। দীর্ঘ ৩৬ বছর রাজত্ব করার পর তিনি মারা যান। রাণীও তাঁর সহগামী হন।

বললাম—বড় একঘেঁয়ে হয়ে পড়ছে আপনার কাহিনী, ঘটনার থেকে বর্ণনা বেশী। আর মানুষের মন এমনই, যে সে মুখে আদর্শের জয়গান গাইলেও সৃষ্টিছাড়া কিছু—প্রেম, হিংসা, সংঘাত এইগুলো পছন্দ করে বেশী।

—তাই নাকি? আচ্ছা সেই ধরণের কথাই বলি:

৬০০ খৃষ্টাব্দের সময় বালাদিত্য কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তাঁর এক সুন্দরী সুলক্ষণা কন্যা ছিল, নাম অনংগলেখা। রাজজ্যোতিষী তার ললাট-লিখন পাঠ করে বললেন, ভবিষ্যতে সে হবে কাশ্মীরের মহারাণী। রাজা ভাবলেন, হোক

সে নিজের মেয়ে, তাঁর পিতৃপুরুষের রাজত্ব চলে যাবে অন্য বংশের হাতে! তিনি বিধিলিপির ওপর কলম চালাতে চাইলেন। কন্যাকে রাজপুত্রের সংগে বিয়ে না দিয়ে সাধারণ ঘরের দুর্লভবর্ধনকে জামাতা করেন। দুর্লভবর্ধন তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অমায়িক ব্যবহারে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। মহারাজ প্রীত হয়ে তাঁকে বিভূষিত করলেন প্রজ্ঞাদিত্য নামে এবং বহু ধনসম্পদও তাঁকে দিলেন।

অপরদিকে রাজকুমারী পিতামাতার আদরিণী কন্যা ; অনিন্দিত রূপ, উদ্ধত যৌবন আর অতুল ঐশ্বর্যের মদগর্বে স্বামীকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে লাগল। বিলাসপ্রিয় স্বভাব, পিতৃগৃহের অবাধ স্বাধীনতা, এবং স্বামীর সদাশিব ভাব তার কুপথে যাবার সহায় হয়েছিল। অনংগলেখা মন্ত্রী খড়্‌গকে বহুবার দেখবার এবং ক্রমে মেলামেশা করবার সুযোগ পায়। আলাপ, মৃদুহাসি, সংগপ্রীতি ক্রমে গভীর ভালবাসায় পরিণত হল। প্রথমে প্রেমের অভিসার চলত গোপনে। লজ্জা, ভয়, আভিজাত্য, সব একে একে চলে গেল এবং দিনের পর দিন অনংগলেখা নির্লজ্জ-ভাবে তার লালসা চরিতার্থ করতে লাগল। অর্থ ও পদমর্যদার বিনিময়ে মন্ত্রী মশাই রাজকুমারীর শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বার তাঁর জন্য উন্মুক্ত রেখেছিলেন। রাত্রের অন্ধকারে দুটি প্রাণী কলুষিত করে চলল জীবনের পরম সম্পদকে, চরিতার্থ করে চলল মানবের আদিম মনোবৃত্তি। দুর্লভবর্ধনও শুনতে পেলেন তাঁর স্ত্রীর গোপনে দেহ বিনিময়ের কথা। সত্য নির্ধারণ করার জন্যে একদিন নিশীথে গোপনে তিনি স্ত্রীর শয়নাগারে প্রবেশ করলেন। গভীর বেদনাপ্লুত চিত্তে তঁকে দেখতে হল, নিজের স্ত্রী অপরের অংকশায়িনী—মন্ত্রীর বক্ষপুটে নিশ্চিন্ত-নিদ্রিত। ক্রোধে, ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন—অগ্নিস্ফুলিংগ ঠিক্‌রে পড়তে লাগল, প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল তাঁর চোখ। স্বামী ত দূরের কথা, কোন মানুষই এ দৃশ্য ক্ষমার চোখে দেখতে পারে না। কিন্তু বহু কষ্টে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। এই কিনা তাঁর স্ত্রী—তিনি তাকে আজও ভালবাসেন। তার মনে হল, স্ত্রীলোকের জীবন দেহের ক্ষুধা মেটাবার উপকরণ মাত্র—সাধারণ পণ্যের মত সে তার

পরম সম্পদকে হেলায় বিলিয়ে দেয়; তার নারীত্বকে উপভোগ করে, অপমানিত করে, কলুষিত করে। কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে হঠকারিতা করা উচিত নয়। তাতে বিপদ ত আছেই, লোকলজ্জারও ভয় আছে। নারীর মন অব্যবস্থ, চঞ্চল। সে ক্ষণিকের মোহ থেকে নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। কিন্তু পুরুষ এত দুর্বল-প্রাণ হলে চলবে কেন? আমার প্রাণে আঘাত লেগেছে, কারণ আমি তাকে ভালবাসি। তাকে হত্যা না করে তার প্রতি আমার ভালবাসার সমাধি দিলেই সব মিটে যায়। ভালবাসা মানুষকে অভিমানাহত করে, ক্রুদ্ধ করে; কিন্তু অবহেলার পাত্রের ওপর মানুষ নির্বিকার। এই সব চিন্তা করে তাদের অজ্ঞাতে খড়্গের কাপড়ে লিখে দিলেন—মৃত্যুই তোমার উচিত শাস্তি, কিন্তু তোমাকে আমি এবারের মত ক্ষমা করলাম। তোমার কৃতকর্ম ও আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখো।

নিদ্রাভংগ হলে মন্ত্রী দেখতে পেলেন কাপড়ের লেখা। শংকা আর লজ্জায় মন ভারাক্রান্ত হল। এতদিনে অনুভব করতে পারলেন, সত্যি তিনি কত বড় অপরাধী। অনংগলেখার প্রতি তাঁর মোহ যেন তড়িতাহত হয়ে দূরীভূত হল। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, দুর্লভবর্ধনের অনুগ্রহের প্রতিদান তিনি দেবেন।

রাজা বালাদিত্যের মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করার জন্যে চলল ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম। তখন খড়্গের সহায়তায় দুর্লভবর্ধন রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

৯৯২ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন কাশ্মীরের রাজা চক্রবর্মা। এক পরদেশী দুই কন্যা নিয়ে কাশ্মীরে এল, হংসি আর নাগলতা, দুজনেই সুগায়িকা। রাজা শুনলেন সেকথা। একদিন রাজসভায় তাদের ডাক পড়ল। সংগীত-আসরে গানশুনে সবাই মোহিত হয়ে গেল, রাজা সব ভুলে সভার মাঝেই তাদের আলিংগনবদ্ধ করলেন। সভা ভংগ হল, কিন্তু রাজার মন পড়ে রইল হংসি আর নাগলতায়। পরে ঘন ঘন সংগীতাসর বসতে লাগল এবং শেষে রাজা গানের সংগে গায়িকাদেরও বেঁধে ফেললেন তাঁর মন-মন্দিরে। অচিরে

হংসি হল পাটরাণী। রাজাও ক্রমে তাঁর মান-সম্ভ্রম, বিদ্যাবুদ্ধি সব হারালেন। শেষে পরিণত হলেন একজন লম্পট, স্ত্রৈণ কাপুরুষে। হংসির উচ্ছিষ্ট পানপাত্র যে সগর্বে খেয়ে ফেলত, সে হত পদস্থ সভাসদ। রাণী তার ঋতু মাখান কাপড় সভাসদদের উপহার দিতেন। তাঁরা তা পরিধান করে রাজসভার শোভা বর্ধন করতেন। একদিন রাজাকে এক সভাসদ মন্ত্রণা দিলেন, দেখুন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। নিশ্চয় এ আমাদের পাপের ফল। দেশকে এই পাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিষে বিষক্ষয়—পাপের ক্ষয় পাপে; আর আমাদের শাস্ত্রেও রয়েছে—কণ্টকে নৈব কণ্টকম্। অপনি যদি ব্রাম্হণ-পত্নীকে অংকশায়িনী করাতে পারেন, পাপ দূরীভূত হবে। রাজাও বোধহয় প্রায়শ্চিত্ত্যের এমনই এক বিধান চাইছিলেন। শেষে অনাচার চরমে উঠল। প্রজারা উত্যক্ত হয়ে তাঁর প্রাসাদে ঢুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে এবং তাঁকে হত্যা করে।

পরবর্তী রাজাও তেমনই অপদার্থ ও লম্পট। তার পুত্র পার্থা পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। শক্তি সংগ্রহ করে রাজধানী লুণ্ঠন করেন। প্রথমে তাঁর মাকে হত্যা করেন, তারপর সকল ভাইবোনদের ঘাতক দিয়ে নিহত করেন। শেষে তাঁরই আদেশে পিতাকে বন্দী করে চুল ধরে টানতে টানতে এক কবর-খানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে উলংগ করে তিলে তিলে হত্যা করা হয়। পুত্র উপভোগ করে পিতার যন্ত্রণাকাতর মৃত্যু-দৃশ্য! মৃত পিতাকে ছুরিকাঘাত করে, তার রক্তে স্নান করে উল্লসিত হয়ে ওঠেন! তাঁর রাজত্বে বোধহয় সকল অপকর্মের সীমা ছাড়িয়ে যায়। কোন বেশ্যার কাছে অসদ্-ব্যবহার পেয়ে তিনি সমস্ত বেশ্যার স্তন কেটে ফেলে দেবার আদেশ দেন। ভ্রূণ দেখে আনন্দ উপভোগ করার মানসে অন্তঃসত্বা রমণীদের তিনি ধরে আনতেন। পরিশেষে এই বর্বর, অত্যাচারী রাজা পার্থা দীর্ঘ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার পর দেহরক্ষা করেন।

রণাদিত্য রাজা হন ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে। তাঁর গুরুর নাম প্রমোদকান্ত, তিনি

স্বার্থকনামা ছিলেন। রাজাকে দীক্ষা দিলেন—সৃষ্টিতত্ত্বই হল ভগবানের শ্রেষ্ঠ দান, সুতরাং নারীসংগম পুণ্যকর্ম। রাজা ও তাঁর পারিষদ নিজেদের কন্যা এবং ভগ্নিদেরও অব্যাহতি দিতেন না। নাচ, গান ও মদ্যপানে সদা ব্যস্ত থাকতেন এবং জোর করে পুরস্ত্রী ধরে আনতেন। গভীর নিশীথে তাঁরা সদলবলে বেরোতেন পরস্ত্রী অন্বেষণে।

এক রাত্রে রাজা নিত্যকার মত সফরে বেরিয়েছেন। মাঝপথে মৃদু আহ্বান পেলেন তাঁর এক চরিত্রহীন পুত্রবধূর কাছ থেকে। আসক্ত হয়ে ছুটলেন সেই দিকে ; কিন্তু পথের কুকুরগুলো অপরিচিত লোকের গন্ধ পেয়ে ছুটে এল ঘেউ ঘেউ করে, সাড়া শব্দে পাড়া জাগিয়ে তুলল। স্থানীয় লোকেরা তেড়ে এল লাঠি নিয়ে। শেষে স্বয়ং রাজাকে দেখতে পেয়ে শুধু অপমান করেই নিষ্কৃতি দিল। লগুড়াহত হয়ে ফিরে এলেন রাজা কিন্তু তখনও মনে গাঁথা ছিল পুত্রবধূর কটাক্ষ।

বলি—এ যে খালি ড্রেন-ইন্‌সপেক্টরের রিপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন—এটা একটা দিক। অন্য দিক তেমনই উজ্জ্বল।···দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে আপনার বন্ধুরা বিরক্ত হচ্ছে না ত ?

—না না ! দেরী হলে না হয় ওদের বলার কিছু ছিল, কিন্তু সূর্যোদয় দেখার অগে ত কেউ যাবে না। শুনেছি পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্যদেব ওঠেন, অপূর্ব তার শোভা।

—অপূর্ব নয়, খাঁটি পূর্ব থেকে ওঠেন। কাঞ্চনজংঘার সূর্যোদয় দেখার আশা নিয়ে যদি এসে থাকেন ত তেমনি হতাশ হয়ে ফিরতে হবে। পরে বুঝেছিলাম তাঁর কথাই সত্যি।

আবার সুরু করেন—জয়াপীড় নামে আর একজন রাজার কথা বলেই আমার কাহিনী শেষ করব। তিনি মহানুভব, তিনি বীরশ্রেষ্ঠ। কাশ্মীরের ইতিহাস তাঁর যশোগাথায় উজ্জ্বল। ৭৫০ খৃঃ থেকে ৭৭৬ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করার পর পৃথিবী জয়ের মনস্থ করলেন।

প্রস্তুত হল সৈন্য সামন্ত। তখন সীমান্তের সর্দারদের কাছে প্রার্থনা করলেন, সৈন্য সাহায্য দিয়ে তাঁর বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে। সাহায্য করা ত দূরের কথা, তারা উপহাসভরে বলে—তোমার পিতামহ সওয়া লক্ষ সৈন্য নিয়ে যা পারেনি, তুমি মাত্র আশি হাজার সৈন্য নিয়ে সেই আশা চরিতার্থ করতে চাও—তুমি দেখি দুর্জয় সাহসী !

জয়াপীড় তাদের আশা ছেড়ে দিয়েই জয়যাত্রার পথে পা বাড়ালেন। ওদিকে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যবার পর তাঁর শ্যালক বিদ্রোহী হয়ে কাশ্মীরের সিংহাসন দখল করে নিলেন। সেই সুযোগে ঘর-বাড়ী ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক সৈন্যরা লুকিয়ে ফিরে এল দেশে। রাজা বুঝলেন সব। তখন জানতে চাইলেন, কারা কারা দেশে ফিরে যেতে চায় ? তাদেরও ফিরে যাবার অনুমতি দিলেন। অবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে গেলেন প্রয়াগ ; সেখানে দানোৎসবের অনুষ্ঠান করলেন—এক কম লক্ষ অশ্ব দান করলেন ব্রাম্হণদের এবং তার স্মৃতি স্বরূপ গড়লেন এক সুউচ্চ মিনার। বললেন—যদি কেউ আমার দানকে অতিক্রম করে, তখন এই মিনার ভেঙে যেন আর একটি উচ্চতর মিনার তিনি গড়েন, তবে তার আগে নয়। অতঃপর সৈন্যবাহিনীকে দেশে ফিরে যেতে বললেন। নিজে ছদ্মবেশে গেলেন গৌড়রাজ জয়ন্তের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধনে। এই শান্তিময় রাজ্যে পদার্পণ করে তাঁর মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। নৃত্যগীতানুরাগী মহারাজ কোন এক মন্দিরে নূপুর-নিক্কণ শুনে প্রবেশ করলেন তার মধ্যে। মন্দিরদ্বারে এক প্রস্তরাসনে বসলেন। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন নৃত্যোৎসব। নৃত্যরত কমলা তাঁর রাজসুলভ অকৃতি দেখে বুঝল, এ নিশ্চয় ছদ্মবেশে কোন রাজপুরুষ। উৎসবের শেষে মধুর আলাপনে সে রাজাকে পরিতুষ্ট করল এবং নিজের গৃহে আহ্বান করে নিয়ে গেল।

বিশ্রামান্তে কমলা নৃত্য-গীতে, হাস্যে-লাস্যে, আভাসে-ইংগিতে জয়াপীড়কে প্রলোভিত করতে লাগল। কিন্তু রাজার কাছে কোন উৎসাহ না পেয়ে একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। রাজা তখন সস্নেহে তাকে নিজের বুকে টেনে নিয়ে বলেন—

তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার রূপ-লাবণ্যে, তোমার আহ্বান-ইংগিতে সাড়া দিতে পারছি না ; তবে এ আমার অবহেলা বলে ভুল বুঝো না। আমার মন পড়ে আছে এক মহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে। সত্যিই ত পৃথিবী জয়ে যাঁর বাসনা, সামান্য নারীর প্রলোভন কি তাঁকে ভোলাতে পারে! কিন্তু প্রলোভন যা পারে না, স্নেহ তা সম্ভব করে। কমলার বাঁধন ছিঁড়ে রাজা অন্য কোথাও যেতে পারলেন না, সেখানেই থেকে গেলেন।

একদিন সন্ধ্যার পর রাজা জয়াপীড় নদীতীরে পূজা-অর্চনা করতে গিয়েছিলেন। গভীর রাত্রে ফিরে এসে দেখেন, বাড়ীর সবাই তাঁর ফিরে আসতে দেরী দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। আশ্চর্য হয়ে তাঁর জন্যে এমন অমূলক আশংকিত হবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ?

কমলা বলল—তুমি কি জান না, এখানে এক সিংহের উপদ্রব সুরু হয়েছে ? রাত্রে অনেক হাতী, ঘোড়া এবং মানুষের প্রাণ নাশ করছে ? তোমার আসতে দেরী দেখে তাই আমরা শংকিত হয়ে পড়েছিলাম।

একথা শুনে রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন।

পরদিন রাত্রে বাড়ী থেকে বেরোবার সময় বললেন—আজ যেন আবার উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে থেকো না। চিন্তিত হবার কিছু নেই। কালই দেখতে পাবে, কে কাকে বধ করে।

এক বটগাছের তলায় বসে জয়াপীড় সিংহের অপেক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন জ্বল জ্বল করছে দুটি চোখ—যমদূতের মত এগিয়ে আসছে। সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে তিনি হুংকার করে উঠলেন। সিংহও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে রাগে গর্জন করতে করতে লাফিয়ে পড়ল জয়াপীড়কে লক্ষ্য করে। তিনি ছোরা সমেত হাতখানি সোজা ঢুকিয়ে দিলেন সিংহের মুখের ভেতর এবং এক পলকে তার হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন করে ফেললেন। প্রাণহীন পশুরাজ ঢলে পড়ল মাটিতে।

পরদিন সকালে গৌড়রাজ দেখতে পেলেন দুর্দ্ধর্ষ সিংহটি মৃত, আরও আশ্চর্য

হলেন, যখন তার মুখ থেকে পাওয়া গেল একটা বালা, তার গায়ে লেখা, 'শ্রী জয়াপীড়'।

রাজা বলেন—সেকি ? জয়াপীড় কোত্থেকে এল ?

জয়াপীড় এই রাজ্যে আছে অথচ রাজকর্মচারীরা জানতে পারেনি ! এই অক্ষমতা প্রমাণিত হওয়ায়, তারা লজ্জিত এবং শংকিত হয়ে পড়ল।

রাজা তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন—শংকিত হবার কিছু নেই। সে আমার শত্রু নয়, পরম আত্মীয়। তোমরা ত জান, আমার কোন পুত্র-সন্তান নেই, আমার কন্যার সংগে তার বিয়ে দিয়ে যোগ্যপাত্রে রাজ্য সমর্পণ করে যাব।

একথা কমলার কানে যেতেই সে রাজাকে জয়াপীড়ের অবস্থিতির কথা জানিয়ে এল। স্নেহের মর্যাদা রক্ষায় কমলা নারীজীবনের বৃহত্তম ত্যাগ স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নিল।

রাজকন্যার সংগে জয়াপীড়ের বিবাহের পর, জামাতার বাহুবলে গৌড়রাজ মহাবিক্রমশালী হলেন। এদিকে কাশ্মীরের সৈন্যাধ্যক্ষ জয়াপীড়কে দেশে ফিরে আসবার জন্যে অনুরোধ করলেন। জয়াপীড় স্ত্রী ও কমলাকে সংগে নিয়ে চললেন দেশের দিকে। পথে কান্যকুব্জ জয় করেন। কাশ্মীরে এসে শ্যালকের সংগে যুদ্ধ করতে হল। ভয়াবহ যুদ্ধ হল কয়েকদিন। শেষে স্থানীয় এক চণ্ডাল নিজের জীবন বিপন্ন করেও আদর্শহীন অনধিকারী রাজাকে এক প্রস্তরাঘাতে নিহত করে।

জয়াপীড় এবার কাশ্মীরের উন্নতিতে মন দিলেন। কাশ্যপমুনি এনেছিলেন চন্দ্রভাগা নদী ; তিনি বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে খাল কেটে দেশে জল-সেচের ব্যবস্থা করেন ; স্বার্থক করেন সুজলা-সুফলা নামকে। দেশ-বিদেশের জ্ঞানী মানী লোককে আহ্বান করে আনেন তাঁর রাজ্যে। কাত্যায়নের পাণিনি বিশ্লেষণ ও পাতঞ্জলীর ভাষ্য সংগ্রহ করতে সুরু করেন এবং নিজেও পাণিনি ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রাজত্ব কালে ধনীর চেয়ে বিদ্বানের সমাদর বেশী ছিল। কবি

দামোদর গুপ্তকে করলেন প্রধান মন্ত্রী এবং পণ্ডিতদের রাজসভায় উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। তিনি বহু মঠ, মন্দির নির্মাণ করেন ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশে শান্তি, শৃংখলা ও সৌভাগ্য সূচিত হবার পর আবার তাঁর পৃথিবী-জয়ের বাসনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বিপুল রণসম্ভার সুসজ্জিত হল। মেদিনী জয়াপীড়ের সৈন্যভারে প্রকম্পিত হল। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—তার প্রভুত্ব সর্বোপরি।

রাজা ছদ্মবেশে কাশ্মীরের পূর্বপারে অবস্থিত ভীমসেনের দুর্গে প্রবেশ করেন, গোপনে শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করতে। মৃত শ্যালকের ভাই প্রতিশোধ নেবার জন্যে সে কথা জানিয়ে এল ভীমসেনকে—জয়াপীড় তোমার দুর্গে। প্রতিপক্ষের হাতে বন্দী হলেন জয়াপীড়, কিন্তু হতাশ হলেন না। অপেক্ষা করতে লাগলেন শুভক্ষণের। সুযোগও এল। কিছু দিন পরে মাকড়সার বিষের প্রতিক্রিয়াজনিত এক সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ল ভীমসেনের রাজ্যে। জয়াপীড় গোপনে এক বনৌষধি আনালেন। তার রস সেবন করার পর তাঁর জ্বর দেখা দিল, শরীর ফুলে গেল, আর সারা দেহে ঘা কেটে উঠল। ভীমসেন তাঁর সৈন্যশিবিরে রোগ সংক্রামিত হয়ে পড়ার ভয়ে মুক্তি দিলেন রাজাকে।

আবার যুদ্ধের তোড়জোড় চলতে লাগল। এবার নেপাল বিজয় পর্ব। নেপালের রাজা আরামুরি আত্মসমর্পণ করলেন না। এদিকে জয়াপীড় একের পর এক জনপদ অধিকার করে এগিয়ে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে, আর নেপালের রাজা করছেন পশ্চাৎ অপসরণ।

এক নদীর তীরে জয়াপীড় তাঁবু ফেলে আছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন পরপারে শত্রুশিবিরের উল্লাসধ্বনি। তিনি শত্রুর স্পর্ধা দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন এবং যখন শুনলেন, নদীতে জল সামান্য, সৈন্য চালনা করে এগিয়ে গেলেন শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করতে। কিন্তু এই পার্বত্য নদী সম্বন্ধে তাঁর প্রকৃষ্ট জ্ঞান ছিল না। কিছুদূর যেতেই হঠাৎ গভীরতা পেলেন এবং এক ভয়ংকর স্রোত

সসৈন্য রাজাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। কিছু সৈন্য প্রাণ হারাল, কিছু ছিটকে গেল এদিক-ওদিক, আর রাজা কীটের মত অসহায় অবস্থায় ভেসে চললেন। শত্রুপক্ষ সুযোগ বুঝে ভিস্তির সাহায্যে রাজার প্রাণ বাঁচাল। পরে ঢাকঢোল বাজিয়ে বন্দী করে নিয়ে চলল পুরুষসিংহকে।

জনকয়েক অতি বিশ্বস্ত কর্মচারীর পাহারায় জয়াপীড়কে বন্দী করে রাখা হল এক প্রস্তর নির্মিত অট্টালিকায়। মানুষ ত দূরের কথা, সূর্যালোকেরও কষ্ট করে প্রবেশ করতে হয়। চারিদিকে দুর্লংঘ্য প্রাচীর, কেবল এক পাশে এক ফোকর। সেখান দিয়ে শুধু দেখা যায় সামনের কালগণ্ডিকা—সুবিস্তৃত পার্বত্য নদী।

মন্ত্রী দেবশর্মা এলেন রাজার উদ্ধারের আশায়—বিনিময়ে যদি জীবন দিতে হয়, তাও প্রস্তুত। প্রথমে একজন মিষ্টভাষী দূতকে পাঠালেন নেপালের রাজদরবারে এবং প্রস্তাব পাঠালেন—রাজার মুক্তির বিনিময়ে নেপাল রাজ্যের অধিকৃত সকল ভূভাগ ফিরিয়ে দিতে এবং প্রচুর ধনসম্পত্তি দিতেও প্রস্তুত।

উভয় পক্ষের সম্মত প্রস্তাব অনুযায়ী, মন্ত্রী দেবশর্মা নদীর এপারে সৈন্য-সামন্ত রেখে মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর নিয়ে পরপারে নেপালরাজের সংগে দেখা করতে গেলেন। দু-দিন ধরে আলোচনা হবার পর সন্ধির সর্ত নির্ধারিত হল।

তখন দেবশর্মা জয়াপীড়ের সংগে দেখা করার অনুমতি পেলেন। রাজাকে এত কাতর হতে বোধহয় তিনি কোন দিন দেখেননি। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আপনি হতাশ হয়ে পড়লে আমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখুন? ভগবান আপনার সুদিন দেবেন। আপনার বিশ্ববিজয়ের আশা আবার সফল হবে।

—এ নিছক দুরাশা! এই নিরস্ত্র, অসহায়, অবরুদ্ধ অবস্থায় আমি কী করতে পারি? আর ওই অপমানকর সন্ধির সর্ত মেনে নিয়ে মুক্তিলাভ! তার থেকে মৃত্যু ভাল।

—না, তা বলি না। এখনও আপনি জানলা থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়তে

পারেন। পরপারে সৈন্যরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। সেখানে পৌঁছতে পারলে নেপালের রাজা ত দূরের কথা, পৃথিবীর সকল রাজ্যের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আপনি দাঁড়াতে পারেন।

—সমস্যা ত সেখানে। সাঁতার দিয়ে এই নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। একটা ভিত্তি পেলে না হয় চেষ্টা করা যায়। তাই বা পাচ্ছি কোথায়? আর পালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি? সে বড় লজ্জার কথা।...কি করি? আমি অসহায়! শিশুর মত অসহায়, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত ক্ষমতাহীন!

—আচ্ছা, চিন্তিত হবেন না। ঘরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, দু-দণ্ড বাদে আসবেন, আপনার যাবার ব্যবস্থার ভার আমার।

অবিশ্বাসের সংগেই রাজা বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে ফিরে এসে দেখেন, মন্ত্রী তার পরিধেয় বস্ত্র গলায় বেঁধে মৃত্যু বরণ করেছে আর দেহের ওপর নিজের রক্ত দিয়ে লিখে গেছে—আমি মৃত; কিন্তু এই দেহ ভিত্তির অভাব মেটাতে পারবে। আপনি আমার দেহের ওপর চড়ে ওপারে চলে যান।

রাজা প্রথমে বিস্মিত হলেন, পরে বেদনায় মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, জগতে বীর বলে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য যদি কেউ থাকে সে দেবশর্মা। আমি তার তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু দুঃখ করার সময় এ নয়, তখুনি নদীতে ঝাপিয়ে পড়লেন।

রাজাকে ফিরে পেয়ে সৈন্যদলের প্রাণশক্তি ফিরে এল। জয়াপীড় আবার নতুন উদ্যমে নেপাল রাজ্য আক্রমণ করেন এবং অনায়াসে শত্রুকে পরাজিত করেন। রাজা নিজের পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পেরেছিলেন, কিন্তু মন্ত্রীর আত্মত্যাগের কথা কোনদিন ভুলতে পারেননি।

বললাম—একটা প্রশ্ন আছে। সবই ত হিন্দু রাজার কথা বললেন; তাছাড়া এ দেশটা হিন্দুদের বড় তীর্থক্ষেত্র, চারিদিকে মঠ-মন্দির কিন্তু বর্তমানে কাশ্মীর-বাসীর সবাই ত প্রায় মুসলমান?

শুনুন তাহলে, খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি—১৩৩৯ খৃঃ কাশ্মীর শাহমীর নামে

এক মুসলমান রাজার অধীন হয়। তিনি যেমন অত্যাচারী ছিলেন তেমনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁর রাজত্বে ধর্মান্তর গ্রহণ বা মৃত্যুদণ্ড ছাড়া তৃতীয় পথ কিছু ছিল না। তিনি মন্দির ধ্বংস করেন, সেই প্রস্তর দিয়ে গড়েন মসজিদ এবং বহু হিন্দুশাস্ত্র ডালহ্রদে ভাসিয়ে দিয়েছেন। যারা মুসলমান হতে চায়নি বস্তাবন্দী করে ডালের জলে দিয়েছেন সমাধি। অবশ্য মোগলের শাসনকালে দেশ শান্তিতে ছিল। তবে অত্যাচারে যা পূর্ণাংগ হয়নি, ভালবাসায় ভুলিয়ে, প্রলোভনের মোহজালে তা আধিপত্য বিস্তার করেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেছে মুসলমান ধর্ম। শেষে ডোগরা বংশের গোলাব সিং শিখদের বিরুদ্ধে ইংরাজের পক্ষে যোগ দেন। তাই বৃটিশ মহারাজ গোলাব সিংকে করে দিলেন কাশ্মীরের মহারাজ। কিন্তু তখন দেশবাসী মুসলমানে ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে।

*　　*　　*　　*　　*

তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আজ দুপুরটা বিশ্রাম। এবার ফিরে যাবার পালা। সেদিন বিকেলে বেরোলাম বাজার করতে। আত্মীয়-স্বজন আছে, বাড়ীর ছেলে মেয়ে আছে, সবার ওপর আছেন 'তিনি' অর্থাৎ 'ওগো' বা 'শুনছো'। তারা ত পথ চেয়ে বসে আছে কি নিয়ে যাব তাদের জন্যে। পাত্র ভেদে রকমারি জিনিষ কিনতে হবে।

কথায় বলে কাশ্মীরী শাল; কিন্তু তা কেনা মানে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় দাঁড়ায়, সে এক মস্ত শাল; অবশ্য নিজের প্রয়োজন হলে আলাদা কথা। শেলী আবার ঘোর সংসারী; সে বলে—এগুলো হল এক্সট্রা ড্রেনেজ অফ মানি। এখানকার সিল্কের শাড়ী খুব বিখ্যাত। শাড়ীর ওপর কাজ এত সূক্ষ্ম, এত নিখুঁৎ যে তার তুলনা হয় না। কিন্তু সমস্যা একই, দাম শুনলে আমাদের

মত সাধারণ মধ্যবিত্ত বা বিত্তহীনের মনে হয়, শাড়ী নয়ত সাঁড়াশী—গলা টিপে ধরে। বরং 'তাঁর' মুখ ঝাম্‌টা দু-দিন খেতে পারি, মানভঞ্জনের পালা বসাতে পারি কয়েক রাত।

পেশ্‌মন আছে, বেশ সস্তা। স্থানীয় পশম ও গরম পোষাকও বেশ সস্তা। আর বিখ্যাত হল অপরূপ কারুকার্য করা চানার কাঠের জিনিষ। কী চমৎকার! ফোক আর্টের অপূর্ব নিদর্শন। যার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্যে ভারতবর্ষ গর্বিত। এই চানার কাঠের স্বভাবধর্ম একে আরও লোভনীয় করে তুলেছে। এর স্বাভাবিক রঙই পালিশ করা জিনিষের মত, আর যত দিন যায় তার জৌলুষ বাড়ে।

গুরুবাক্য স্মরণ করেই বাজার করতে বেরিয়েছিলাম। তাদের বলা দরের এক-চতুর্থাংশ থেকে সুরু করলাম ; শেষে বিরক্ত হয়ে অর্ধেক কেন চার ভাগের তিনভাগ পর্যন্ত উঠেছিলাম, তাও কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি। শেষে রেগে ফিরে এলাম ; থাকগে যাক, আজ না হয় নাই কিনলাম, আরও দু-চার দিন ত আছি।

এখান থেকে প্লেনে জম্মু যেতে সামান্য কয়েক টাকা বেশী পড়ে ; তেমনি বাস যে পথ দেড় দিন নেয়, প্লেনে লাগে মাত্র একঘণ্টা। তাছাড়া প্লেনে চড়ার আনন্দ না থাক, আভিজাত্য ত আছে। কিন্তু টিকিট কিনতে গিয়ে শুনলাম, সাতদিনের আগে কোন সীট খালি পাওয়া যাবে না। পুরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে? নাঃ, বাসই আমাদের স্বজাত, ওই আমাদের ত্রাণকর্তা।…কিন্তু তারাও বলে, আগামী চার দিনের মধ্যে কোন সীট পাবেন না। সেকি? চা-র দি-ন? তবে কাল ভোরে একটা অতিরিক্ত বাস দেওয়া হয়েছে, তার চারখানা সীট এখনও খালি আছে। দু-এক দিন অন্তত বিশ্রাম করার বাসনা ছিল, তা আর হল না।

ভোরবেলা যাত্রা করতে হবে, তাই রাত্রেই বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। বাস কম্পানীর অনুগ্রহে পাওয়া গ্যারেজ সেডের মধ্যে কয়েকটা

চেয়ার দিয়ে রাজশয্যা পাতলাম। কিন্তু ঘুম ছিল না চোখে, কাশ্মীরের নানা স্মৃতি একের পর এক মনের দুয়ারে আঘাত দিচ্ছিল।

*　　*　　*　　*　　*

একি! একদল লোক আমার চতুর্দিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, পোড়খাওয়া চেহারা, জৌলুষ যা আছে তাতে অতি পরিশ্রমের চিহ্ন, অভাবের ছাপ, দৈন্যের নিদর্শন—সম্পদ ও বিলাসিতার নয়। কেউবা কংকালসার; কারো কোটরগত চোখ ঠিকরে বেরোচ্ছে, তাতে যেন আগুনের ফুল্‌কি। বিকট রব তুলেছে তারা—অভিযোগ, প্রতিহিংসা, প্রতিশোধ। হতাশার সকরুণ দীর্ঘশ্বাস বিষাক্ত করে তুলেছে আবহাওয়া—প্রতিহিংসার বিকট অট্টহাস্যে করছে ত্রাসের সঞ্চার।

ভয়ে শুকিয়ে গেল আমার মুখ, বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। ভাবলাম, এরা আমার কাছে ছুটে এসেছে কেন? মারতে চায় নাকি? ওদের কাছে কি এমন অপরাধ করলাম?

প্রথমে এগিয়ে এল এক তরুণ বালক; খুব লাজুক, মুখে নম্র ভাব, কথা বলতে যেন তার কত সংকোচ। অতি ধীরে ধীরে বলে—চিনতে পারছেন না? সৌরগ্রামে আমার বাড়ী। আমরা বড় দুঃখী, বাড়ীতে বুড়ো বাবা রয়েছে, আমার ছোট বোন রয়েছে। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি; কিন্তু তাও তাদের দুঃখ দূর করতে পারি না, তাদের পেট ভরে খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই। বলতে পারেন, এখন আমি কী করতে পারি? আমার জন্যে ভাবি না; কিন্তু কি উপায়ে ওদের মুখে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারি, দয়া করে জানিয়ে দেবেন কি?

তারপর আর একজন এসে দাঁড়াল……ও, তুমি ত সেই টাঙাওয়ালা না? চিনেছি। কিন্তু তুমি এখানে? তোমার মেয়ে কেমন আছে?

সে বলে—জানেন বাবু, সেদিন যেতে যেতে কেঁদে ফেলেছিলাম আপনাদের কাছে, মেয়ে বোধহয় আর বাঁচেনা! বড় অসুখ, ডাক্তার দেখান ত দূরের কথা, পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি কোন দিন; পথ্য যোগাড় করতে পারি না যখন, ওষুধের কথা চিন্তা করা বাতুলতা।

সেদিন টাকা নিয়ে গেলাম; খুকীর আমার ওষুধ পেটে পড়ল, কিন্তু অত জোরালো ওষুধ সইবে কেন বাবু! সেদিনই সে মারা গেল। আপনাদের দেওয়া টাকার আর প্রয়োজন নেই, ফেরৎ নিন।

······তোমায় ত চিনলাম না, কে তুমি?

—আমি একজন চাষী, উরীতে সামান্য জমিজমা ছিল। কোনক্রমে দিন কেটে যেত, কিন্তু যুদ্ধে সে সব জমি ছারখার হয়ে গেছে। অভাবের তাড়নায় সহরে চলে এলাম। যদি কিছু কাজ পাই, হয়ত আরও কিছুদিন সংসারের সবাইকে বাঁচাতে পারব। কিন্তু আল্লা বোধহয় আর বেশী কষ্ট দিতে রাজি নয়? নিজের কোলে টেনে নিতে চান। কোথায় পাব কাজ? সবাই বলে, লোক রাখব কোত্থেকে, আমরা এখন সম্বলহীন, কাশ্মীরে আর লোকে বেড়াতে আসে কৈ? তাই ত নিজেদের পেট চালান ভার হয়েছে। আচ্ছা বাবু, এর কি কোন প্রতিকার নেই?

দলের পেছন থেকে একজন ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে। চীৎকার করে বলে—এর প্রতিশোধ চাই! এর প্রতিশোধ চাই!

এতক্ষণে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছিলাম, হঠাৎ কর্কশ শব্দ শুনে আবার ভয় হল, জড়ো-সড়ো হয়ে বসলাম। এবার যে এল তার চোখে যেন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে, রুক্ষ-কর্কশ আকৃতি।

সে প্রশ্ন করে—বলতে পারেন, কেন আজও আমাদের এই দুর্দশা—দেশটা কি এতই গরীব, এতই অনুর্বর যে তার সন্তানদের খেতে দিতে পারে না, মানুষ হয়ে বাঁচবার সুযোগ দিতে পারে না? অথচ শুনতে পাই, আমাদের দেশ নাকি সুজলা, সুফলা; তাছাড়া রয়েছে বনসম্পদ, প্রকৃতির অযাচিত

দান, অজস্র ফলে ফুলে ভরা ; নানা রকম পশমী জিনিষ, কাশ্মীরী শাল, আর দেশবাসীর অমর শিল্প-প্রতিভা। কিন্তু তবু আমরা গরীব, দু-মুঠো খেতে পাই না। নিশ্চয় এর পেছনে চক্রান্ত আছে—ঘোরতর চক্রান্ত। বলে দাও, এ কার ষড়যন্ত্র। আমরা প্রতিশোধ চাই, আমরা বাঁচতে চাই, পেটভরে খেতে চাই! নিশ্চয় এর পেছনে তোমাদের হাত আছে!

ক্রমে রক্তচক্ষু করে এগিয়ে আসতে থাকে আমার দিকে।

শেষে আমায় অপরাধী খাড়া করে শাস্তি দেবে নাকি? গলা শুকিয়ে যায়। তবুও প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে আমৃতা আমৃতা করে বলি—আমরা কেন, আমরা···আমরা ত ভাই তোমাদেরই একজন। বাইরের ঠাঠ্টা আছে, ভেতর ফোঁপরা—দেনার দায়ে মাথা ডুবে আছে। অভাব আর আভিজাত্য, দু-দিক থেকে আমাদের গ্রাস করেছে। সামর্থ্য নেই তবুও শিক্ষা নিতে হবে, সামাজিকতা রক্ষা করতে হবে, ওপরতলার সংগে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে, তাদের দলে ভিড়ে সমান তালে পা ফেলতে হবে। সত্যি, আমরা বড় অসহায়—সাহস নেই, প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকুও নেই—আমরা দেউলে, আমরা নিঃস্ব; আরও বড় অভিশাপ, আমাদের বঞ্চিত রাখার মূলে আমাদেরই বুদ্ধি, আমাদেরই পরিচালনা।

······এবার এল এক সৌম্যমূর্তি। পিঠে হাত রেখে সাহস দিল। বলল, ভয় পেয়েছ? ও কিছু নয়, ক্ষণিকের দুর্বলতা। চোখ মেলে চেয়ে দেখ সামনের দিকে, আশায় বুক বাঁধো, দেখবে ভবিষ্যৎ কী উজ্জ্বল। দৈন্য নেই, দারিদ্র্য নেই, সংঘাত নেই, শোষণ নেই। দেশের মানুষ সুস্থ সবল মনে বেঁচে আছে, পেট পুরে খাচ্ছে, প্রাণের আনন্দে কাজ করছে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে জন-সমষ্টির কি বিপুল আগ্রহ। আজ কেউ আধপেটা খেয়ে নেই, চিকিৎসার অভাবে কেউ অকালে প্রাণ হারায় না। সবাই পাচ্ছে শিক্ষা—নাম সই করার যোগ্যতা নয়, মানুষ হবার উপকরণ।

* * * * *

ঘুম ভেঙে গেল, চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম যাত্রার তোড়জোড় চলেছে। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই বাস ছেড়ে দিল। ওই দূরে চিরতুহিনাবৃত হিমালয়ের গিরিশৃংগ। পথের দু-ধারে চানার গাছের ঘন সারি, মাঝে মাঝে আসছে ঝর্ণার কলধ্বনি, ভেসে আসছে বনফুলের সুবাস। ক্রমে ফেলে চললাম সাধের কাশ্মীর—প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড—মরজগতের অমরতীর্থ—চিরবিচিত্র ভূস্বর্গ। কিন্তু তখন মনে বাসা বেঁধেছিলো গত রাত্রের স্বপ্নের কথা। কাশ্মীর বেড়ান আমাদের পক্ষে একদিন স্বপ্ন ছিল, তা সফল হল। কাশ্মীরের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন আজ দেখলাম, কাল হয়ত তা সত্য হতে পারে।

সমাপ্ত